আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

-স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী সংখ্যা-

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

পত্রিকাধ্যক্ষ

উপাধ্যক্ষ শ্রীদুলাল কুমার মিত্র

সম্পাদক

শ্রীমুকুন্দলাল ভট্টাচার্য্য

৪৫তম সংখ্যা ১৯৭১-৭২

THREE VOWS

Truth

Truth and Truth alone is the greatest treasure. The world rests in God, who is itself Truth. I will hold on to Truth —this is my firm resolve.

Study

Study is the highest austerity for students. Holding fast to good habits, I will in all humility, strive to study hard.

Service

God resides in the hearts of all men. My heart will be ever ready to accept them in the same spirit. Pure in heart, I will therefore serve humanity with all sincerity. My earnest efforts will always be for the welfare and prosperity of my country.

প্রচ্ছদপট-শিল্পী
অমলেশ ঘোষ

ব্লক ও প্রিন্টিং
সাউথএণ্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬১ নাকতলা, কলিকাতা-৪৭

আশুতোষ কলেজ, ৯২ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬ হইতে
অধ্যক্ষ শ্রীনীরদ কুমার ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত এবং সাউথএণ্ড
প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ১/৬১, নাকতলা, কলিকাতা-৪৭ হইতে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

স্বাধীনতার 'রজত জয়ন্তী সপ্তাহ'তে আশুতোষের আলোকচিত্রে মাল্য-দান করছেন ছাত্র সাধারণ সম্পাদক শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়। পাশে পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীশোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

ফটো : শিশির ষ্টুডিও।

স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বর্ষে

স্মরণ করি

তাঁদের

যাঁদের

আত্মদানে

আমাদের এই স্বাধীনতা।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ	অধ্যক্ষ নীরোদ কুমার ভট্টাচার্য্য	৭
আত্মসমীক্ষা	উপাধ্যক্ষ দুলাল কুমার মিত্র	৮
সম্পাদকীয়	মুকুন্দলাল ভট্টাচার্য্য	৯
আমায় নিয়ে চল স্মৃতি হয়ে যাওয়া শিশু কালের কাছে	অসীম কুমার দত্ত	১৩
দুঃখ জয়ের গান	দ্বীজেন দত্ত	১৪
ভারত থেকে ভিয়েতনাম	দেবপ্রসাদ ঘোষ	১৬
রাজপথ ও মেঠোপথ	রামমোহন ভট্টাচার্য্য	১৮
School Days	Malay Ranjan Saha	১৯
আবর্ত	অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	২০
স্মৃতির ফটোগ্রাফ থেকে	সঞ্জয় মিত্র	২১
আগত	পার্থসারথি সেনগুপ্ত	২২
গ্যালিলিও, সক্রেটিস, যীশু ও একটি লোক	শৈবাল মজুমদার	২৩
নূতনের স্বপ্ন	সূর্য্য কুমার গঙ্গোপাধ্যায়	২৫
সাত্বিক	মানস কুমার জানা	২৬
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি	হরিহর প্রামাণিক	২৮
অচেনা পথ	মাধব চন্দ্র সিংহ সহেসরায়	৩১
অবেলায়	সৌমিত্র বসু	৩৪
অপরাহ্ন অতিক্রান্ত	বিপ্লব রায়চৌধুরী	৩৬
ধরা নাহি দেব	স্বপন কুমার দে	৩৭
মৃত্যের ভোজ	শুভেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৯
As I Understand Shelley	Barun Ghosh	৪২
Talk Through 'Ether'	Ashis Kr. Banerjee	৫১
A Thrilling Sport	Subhas Kantha Roy	৫৫

শিল্পী : মানস রঞ্জন ভুঁইয়া
বিজ্ঞান, দ্বিতীয় বর্ষ

মুখবন্ধ

দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছর ধরে ছাত্রদের কাছে অনেক কথা বলেছি, অনেক শুনেছি। আজও কলেজ পত্রিকার বার্ষিক প্রকাশের সময় কিছু বলার অনুরোধ এসেছে ছাত্রসংসদ ও কলেজ পত্রিকা সম্পাদকের কাছ থেকে। সে অনুরোধ রাখতেই হ'বে।

সবসময়ই নূতন চিন্তাভাবনার প্রয়োজন থাকে তবে আজকের বিরাট সম্ভাবনাময় সামাজিক পরিবর্তনের সময় নূতন করে চিন্তার একটা বিশেষ কারণ আছে ব'লে মনে হয়। বর্তমানে অনিশ্চয়তা নিশ্চয়তা ও স্থায়িত্বের পরিবেশে সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশে অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ও শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরিহার্য। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ছাত্ররাই দেশের ভবিষ্যৎ। একদিন তারাই দেশ শাসন করবে ও নূতন সমাজ গড়বে, তার জন্য চাই প্রস্তুতি, চাই প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞান, চাই চারিত্রিক বল। কালজীবনে এই সমস্ত সংগ্রহের প্রকৃষ্ট সময় ও সুযোগ, এই জীবন আর ফেরে না। সর্বদা প্রস্তুত থাকিনা বলেই খেলার মাঠে catch ফেলি, গোলের সামনে গোল করতে পারি না।

ছাত্রদের কাছে অনুরোধ, এই সুযোগ তারা যেন না হারায়। গরীব দেশ, সুযোগ ও সঙ্গতি সীমিত, তার মধ্যেই নিজেকে গড়ে তুলতে হবে, প্রস্তুত করতে—এই দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়েই জীবন শুরু করতে হবে। কলেজ এই জীবন শুরু করার একটা প্রাঙ্গন। ছাত্রদের এই প্রস্তুতি পর্বে আমাদের অর্থাৎ কলেজ কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, কর্মচারী সকলেরই একটা বিরাট দায়িত্ব আছে। আমরাও এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছি কিনা এ প্রশ্নও প্রাসঙ্গিক ও এই প্রশ্নের উত্তরও দেশ ও সমাজ চাইতে পারে। আমার আশা, আমরাও আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত থাকব।

ছাত্রদের বেতন ও ১৯৪৮-৪৯ সালের পরিপ্রেক্ষিতে স্থিরীকৃত ও সীমিত সরকারী সাহায্য সম্বল করে এই কলেজ তার নির্দ্ধারিত পথে চলছে—এই জন্যই সীমাবদ্ধ সঙ্গতিতে অভাব অভিযোগ থাকা স্বাভাবিক সকলের দিক থেকেই। তবু ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে মানসিক বল ও ধৈর্য্য না হারিয়ে যে যার নিজের কর্তব্যটুকু বিবেকের সঙ্গে সম্পন্ন করলে হয়ত অনেকটা এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। প্রাচুর্যের মধ্যে কাজ করা সহজ, অভাব অনটনের মধ্যে করাটাই প্রতিভা। পশ্চিমবাংলায় ও দেশে নিশ্চয় এই প্রতিভা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তবে এই প্রতিভা বিকাশেরও সুযোগ চাই। এই সুযোগ সমাজ, দেশ ও সরকারকে করে দিতে হবে। শিক্ষাসংস্কার, পরীক্ষাসংস্কার সবকিছুরই প্রয়োজন আছে, আশা করি, সরকার তাতে তৎপর আছেন, তবে সংস্কারের সঙ্গে শিক্ষার জাতীয়করণের প্রশ্নও নিশ্চয় জড়িত। সে প্রশ্ন জটিল হলেও সেটা এড়িয়ে যাওয়াটা escapism বলে মনে হতে পারে।

দেশ, সমাজ ও তারই মধ্যে এই কলেজের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসাবে অতীতে ছাত্রদের অবদান কম হবে না। অতীতের মত আজও নূতন করে সঙ্কল্প করার দিন এসেছে যে সবক্ষেত্রেই গঠণমূলক ও বিশ্লেষণমূলক মনোভাব নিয়ে ছাত্রদের আত্মনিয়োগ করতে হবে। আমরা আশা কোরব, তাদের এই আত্মনিয়োগে আমরা যেন সাহায্য ও সহযোগিতা করতে পারি। মতপার্থক্যের এলাকাকে বড় করে না দেখিয়ে সহনশীলতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে মতৈক্যের এলাকাটা বাড়িয়ে তোলাই আমাদের কর্তব্য।

কলেজের মত প্রতিষ্ঠানে—লক্ষ্য যেখানে অভিন্ন সেখানে কলেজ কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীদের মধ্যে অংশীদারত্বই স্বাভাবিক। শিক্ষার এই মহান লক্ষ্যে আমাদের অংশীদারত্ব যেন অটুট থাকে এই কামনা করি। বর্তমান ও প্রাক্তন সকল ছাত্রদেরই আমার শুভেচ্ছা জানাই, যে কোন ক্ষেত্রেই হোক তারা যেন সকলের প্রশংসার পাত্র হয়। তাদের জীবনেই আমরা বেঁচে থাকতে চাই। আমাদের জীবনের এটাই সার্থকতা।

শ্রীনীরদ কুমার ভট্টাচার্য্য
অধ্যক্ষ

যুগ যন্ত্রণার বিদ্রোহী কবি নজরুল	ধীরেন্দ্র নাথ দাস	৫৭
রবীন্দ্র ভাবনায় বাংলাদেশ	মানস কুমার জানা	৬১
রবীন্দ্র কাব্যে ফুল	মাধব চন্দ্র সিংহ সহেস রায়	৬৪
কথায় রূপায় সঙ্গে চীন ঘুরলাম	পার্থ চট্টোপাধ্যায়	৬৯
নিবোধের দৃষ্টিতে	দীপক দত্ত	৭২
উগ্রপন্থী আন্দোলন শিক্ষানবীশের চোখে	নির্বেদ রায়	৭৩
ভারতের মুক্তি আন্দোলন এবং শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক চেতনা ও 'ভারতবাদ'	পার্থ চট্টোপাধ্যায়	৭৭
নবজাগরণের অগ্রদূত রামমোহন	দুলাল কুমার মিত্র	৮১
শরৎচন্দ্র—সেযুগ, এযুগ	চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্য	৮৩
ছাত্র সংসদ বার্তা		
সভাপতি যা ভাবেন	অধ্যাপক অজয় কুমার সেন	৮৯
সাধারণ সম্পাদকের দু-চার কথা	পার্থ চট্টোপাধ্যায়	৯০
ময়দান থেকে বলছি	ময়ূখাভ সেন	৯১
আমার কথা	প্রেমনাথ সিং	৯৪
আমার বক্তব্য	সোমনাথ বসু	৯৬
ঘটনা প্রবাহ		৯৭
List of Editors		৯৮
ঠিক বেঠিক		১০০

সম্পাদকীয়

আশুতোষ কলেজের সাধারণ নির্বাচনে ছাত্র পরিষদ নিরঙ্কুস সংখ্যা গরিষ্টতা অর্জন ক'রে, কলেজ ইউনিয়ন দখলে সক্ষমতা অর্জন করে। নির্বাচনে জয় পরাজয়টাই বড় কথা নয়। কারণ কলেজে সাধারণ ছাত্ররাই ঐ সকল জয়ী প্রার্থীদের নির্বাচিত করেছেন বলেই জয় পরাজয়ের প্রশ্ন আসে না। কলেজের প্রত্যেক ছাত্রই কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং ইউনিয়নের সহযোগিতায় কলেজে শান্ত পরিবেশ এবং কলেজের উন্নতি কামনা করেন এবং এই উন্নতির দিকে কর্তৃপক্ষের গভীর মনোনিবেশ করা একান্ত প্রয়োজন।

কলেজের উন্নতি করতে হ'লে কর্তৃপক্ষকে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যেমন কলেজ, লাইব্রেরী, সেমিনার এবং বিভিন্ন বিভাগীয় পরীক্ষাগার গুলি। গত দুই বছর আগে পর্য্যন্ত কলেজ লাইব্রেরীর এমন অবস্থা ছিল যে প্রয়োজনীয় বইয়ের তুলনায় অপ্রয়োজনীয় বইয়ের সংখ্যাই ছিল বেশী। বর্ত্তমানে এর সামান্য সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। পরীক্ষাগারগুলির অবস্থা প্রায় সেই রকমই। আবার দেখেছি Department of Geologyর ছাত্রদের, তাদের 50%. Excursion এর দাবীতে আন্দোলন করতে। কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা না থাকার জন্যেই ছাত্রদের এই সকল অসুবিধা ভোগ করতে হয়।

কিন্তু লক্ষণীয় যে কলেজের উন্নতির জন্য আজ সকলেই চেষ্টা করছেন। অধ্যক্ষ নীরদ কুমার ভট্টাচার্য্য দীর্ঘ দিন অসুস্থ থাকাকালীন অবস্থায়, উপাধ্যক্ষ দুলাল কুমার মিত্র সক্রিয় অধ্যক্ষ হিসাবে ছাত্রদের এবং অন্যান্য কাজে সকলকে যে সহযোগিতা করেছেন তা সকলেই উপলব্ধি করছেন। তাছাড়া কলেজে কয়েকজন অতিরিক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়েছে। এই নবাগতদের মধ্যে আছেন উপাধ্যক্ষ দুলাল কুমার মিত্র, অধ্যাপক বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় (ইতিহাস বিভাগ), অধ্যাপক সঞ্জীব বসু (অর্থনীতি বিভাগ), অধ্যাপক কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ), অধ্যাপক কৃষ্ণপদ চক্রবর্ত্তী (রসায়ন শাস্ত্র বিভাগ) এবং উদয়ভানু ভট্টাচার্য্য (বাংলা বিভাগ) আমরা এদের স্বাগত জানাই। এই কলেজের ছাত্র হিসাবে আজ সকলেই গর্বিত যে গণিত বিভাগের অধ্যাপক সুভাষ চন্দ্র নন্দী মহাশয় এবারে ডক্টরেট সম্মান লাভ করেছেন। অধ্যাপক শিশির কুমার দাস (ইংরাজী বিভাগ) পূর্ণ সময়ের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন। অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সঞ্জীব চন্দ্র বসু বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে আংশিক সময়ের জন্য যোগ দিয়েছেন। আমরা এঁদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই এবং সকলের উন্নতি কামনা করি। অন্যদিকে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও রসায়ন শাস্ত্র বিভাগের অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ বছরে অবসর গ্রহণ করায় কলেজে এবার বিরাট শূন্যতা অনুভব করছেন সকল সাধারণ ছাত্রই। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অমিয় রতন মুখোপাধ্যায় ও রসায়ণ শাস্ত্রবিভাগের অশিক্ষক কর্ম্মী রামচন্দ্র সিং আমাদের মায়া ত্যাগ করে পরলোক গমন করেছেন। আমরা মৃতের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি ও ভগবানের কাছে প্রার্থণা করি এঁদের আত্মার চির শান্তি।

অন্যদিকে লক্ষ্য করেছি বাংলার সাংস্কৃতি রক্ষার্তে আজ সবাই স্বচেষ্ট। চলতি বছরের মাঝামাঝি আশুতোষ

আত্মসমীক্ষা

"একা মানুষ ভয়ঙ্কর নিরর্থক। কেননা একার মধ্যে ঐক্য নেই। বহুকে নিয়ে যে এক, সেই হ'ল সত্য এক। বহু থেকে বিচ্ছিন্ন যে সেই লক্ষ্মীছাড়া এক ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন এক।"

আশুতোষ কলেজ পত্রিকার উদ্দেশে কিছু লিখতে বসে কবিগুরুর উপরোক্ত কথাটিই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। মহাবিদ্যাপীঠের সমগ্র ছাত্রের মিলিত কণ্ঠের ঐকতান নিয়ে 'আশুতোষ কলেজ পত্রিকা'র পরিক্রমণ। এই পত্রিকার মধ্যেই ঐক্যবদ্ধ ছাত্র সংহতির প্রতিবিম্ব রূপায়িত হ'য়ে উঠবে। বহুর মিলিত রূপেই হোক তার সার্থক আত্মপ্রকাশ।

ভারতবাসী আত্মবিস্মৃত জাতি। অথচ এই ভারতবাসীই স্বামীজির দেশের লোক, সুভাষচন্দ্র, প্রফুল্ল চাকী যতীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধীর ঈশ্বর সাধক। প্রয়োজন আজ সেই যুবা সম্প্রদায়ের—যারা তারুণ্যে দীপ্ত, সত্যদীক্ষায় প্রোজ্জ্বল, মরণের অভীক মন্ত্র যাদের কণ্ঠে। যে দৃঢ়তা তরুণ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে দেখিয়েছিলেন, যে চরিত্রের দীপ্তি আত্মিক ও রাজনৈতিক পরাধীনতাকে বিদীর্ণ করেছে, সেই মহান পুরুষের সত্যনিষ্ঠা আর তারুণ্য, বীর্য আর দৃঢ়তা ভারতীয় যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ প্রয়োজন। সমস্ত দেশ যে আজ তাদেরই মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যে হাতে মশাল জ্বলে ধ্বংসের, সে মনে সত্যের আগুন জ্বালাবে কে? কে আছে যিনি বলবেন—, 'আমার জীবনই আমার বাণী'। মনে হয় যেন রত্ন-প্রসবিণী ভারতমাতা ঊনবিংশ শতাব্দীতে সব শ্রেষ্ঠ সন্তানের জন্ম দিয়েই বন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। ভারত তাই নানা সমস্যার কুম্ভীপাকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তাকে বলিষ্ঠ হাতে টেনে তুলবে এমন মহান নায়কের শুভ জন্মের জন্য সে করুণ নয়নে প্রহর গণনা করছে। কবে আসবে সেই মন্দাকিনী ধারা যাতে সগর রাজার ষাট হাজার সন্তান ভস্মস্তূপ হতে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে?

সমাজ, রাষ্ট্র এবং জীবনে বিরাট বিপর্যয়কে বরণ করে আজকের মানুষ ক্লান্ত, দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের আঘাতে রক্তাক্ত এবং ক্ষতবিক্ষত। এই আহত বিক্ষত মানুষের ক্লান্তি মুছিয়ে দিয়ে তাদের নতুন জীবন ও নবীন সম্ভাবনার পথ দেখাবার দায়িত্ব ছাত্র সমাজের। সুতরাং সর্বাগ্রে তাদের দেখা উচিত যে কোন রাজনৈতিক যুগকাষ্ঠে যেন তারা বলি হিসাবে ব্যবহৃত না হয়। দেশপ্রেম মঙ্গল বহন করে আনা সত্য, কিন্তু তথাকথিত দেশপ্রেমের অন্ধতা জাতির উত্তর জীবনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলবে। পোলিটিক্যাল ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরে তাকে কেবল ছুটিয়ে দিলেই চলবে না, সেই ঘোড়ার পিছনে দেশ নামে যে একটি গাড়ী রয়েছে, সেটি যাতে ভেঙ্গে না পড়ে, তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এবং সে দৃষ্টিপাত করবার দায়িত্ব ছাত্র সমাজের।

সমাজ, রাষ্ট্র এবং জীবনে আজ ভারতবর্ষ এক বিরাট আত্ম-জিজ্ঞাসার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এ জিজ্ঞাসার জবাব একদিন মিলবেই, উপনিষদের ভারতবর্ষ তার আপন আত্মার মহিমার সত্য-স্বরূপ আবিষ্কার করবেই। আজ এই যুগ সন্ধিক্ষণে কবিগুরুর আশার বাণী স্মরণ করে আমরা প্রস্তুত করব আমাদের মানসিকতাকে—'আশা করব মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হ'বে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।"

অধর্মে নৈবতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

দুলাল কুমার মিত্র
পত্রিকাধ্যক্ষ

ক বি তা

কলেজ ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের বিষয় বস্তু ছিল বক্তৃতা, বিতর্ক এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় আশুতোষ কলেজ, সিটিরামমোহন কলেজ, দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কলেজ, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ গ্রহন করেছিলেন। এদের চেষ্টাকে স্বাগত জানাই। আশা করি প্রতি বছরই এই ধরণের একটি বিশেষ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হ'বে এবং এতে কোলকাতার প্রত্যেকটি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীই অংশ নেবেন। 'সংস্কৃতি রক্ষার' কথাটা তুলেছি কারণ পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় আমাদের দেশ আজ অনেক পিছনে। বহু বছর আগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছিলেন। সবে ধন নীলমনি বিশ্ব সাহিত্যের এই একটি পুরস্কার আগলে ধরে আজও আমরা বরাই করে থাকি। এর পুনরুদ্ধারের কথা কেউ চিন্তা করেন না। ১৯৭২ সালেও সেই পাশ্চাত্যের, জার্মানীর প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীহাইনরিখ বোল সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন হিকস্ এবং এ্যারো।

কলেজ পত্রিকার এই সংখ্যাটির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হওয়ায় আমি আমার সাধ্য মত মোটামোটি একটা সামান্য রূপ দিয়েছি। পত্রিকায় কয়েকটি গল্প এবং প্রায় সব কবিতাই বেশ ভালমানেরই হয়েছে। এই তরুণ প্রতিভাশালী ছাত্রদের সুফল কামনা করি। ছাত্রদের উৎসাহ এবং উদ্যমকে স্বাগত জানাই।

কলেজ পত্রিকা সম্পাদনার কাজে কতটা সফলতা অর্জন করেছি, সেটা নির্ব্বাচনের ভার কলেজের সাধারন ছাত্র এবং অধ্যাপকবৃন্দের। ভবিষ্যতে এই কাজের জন্য সকলের সাহায্য প্রার্থী এবং ভবিষ্যতের জন্য অধ্যাপক বৃন্দের আশীর্ব্বাদ আমার একান্ত প্রয়োজন। সবশেষে, কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বন্ধু, কলেজের ছাত্র সাধারন সম্পাদক শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। যার অক্লান্ত পরিশ্রমে পত্রিকাটি বের করা সম্ভব হ'ল।

মুকুন্দলাল ভট্টাচার্য্য
সম্পাদক
আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

আমায় নিয়ে চল স্মৃতি হয়ে যাওয়া শিশুকালের কাছে

অসীম কুমার দত্ত
বিজ্ঞান, তৃতীয় বর্ষ

অতীতের নীরবতা বর্তমানের ব্যস্ততা আর
ভবিষ্যতের এক গভীর শূন্যতার মাঝে
আমার পৃথিবী, আমার বিশ্ব,
আমার অখণ্ডিত ভারতবর্ষ
আমার বাংলাদেশ, আমার বাড়ী।
সেখানে আমার জন্মভূমির কাছে
এখনো ঘুরে বেড়ায়
স্মৃতি হয়ে যাওয়া আমার শিশুকাল।

সবের মাঝে নূতনত্ব আর পুরাণত্বের লুকোচুরি
ক্রমশঃ সর্বস্ব থেকে নিঃস্ব—
তবুও সে এক শান্ত সুন্দরী,
তুমি আমায় নিয়ে চল
শান্ত সুন্দরী আমার জন্মভূমির কাছে
স্মৃতি হয়ে যাওয়া শিশুকালের কাছে।

আমার আর তোমার মধ্যে। তুমি ছিলে সুন্দরী এবং অহংকারী। সেইজন্য তুমি খালি আমায় আঘাত করেছ। আঘাতে আঘাতে আমি ক্ষতবিক্ষত জর্জরিত হয়েছি। কিন্তু আমার অনমনীয় তেজ, সুকঠোর ধৈর্য্য অটল আত্মবিশ্বাসের কাছে সমস্ত শক্তি কৌশল আর চাতুরি যখন খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়েছিল।

তারপর তোমাকে পাওয়ার জন্য এতদিন ধরে অপেক্ষা করার পর আমার মন হল দুর্বল। আর তোমার আঘাত আনবার শক্তি ও নিপুণতা এক থেকে সহস্রগুন হল। অবশেষে আমি ক্লান্ত হলাম। ছেড়ে দিলাম আশা। আমি তোমার কাছ থেকে মুক্তি চাইলাম।

আজ তুমি তার জবাব দিলে। বললে আমার কাছ থেকে তো মুক্তি নেই! মুক্তি চাইলেও পাওয়া যায় না, ছিনিয়ে নিতে হয়। তা যদি চাও সংগ্রাম কর। তাতে হয় তুমি জিতবে নয় আমি। মাঝখানে কোনো পথ নেই। বলো, তুমি হেরে গিয়েছ?

ধীরে ধীরে আমার চেতনায় ঘুম ভাঙল। আমি সিংহবিক্রমে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম "না"!
সমুদ্রের শব্দ গান হয়ে বাজছে। দুঃখজয়ের গান।

দুঃখজয়ের গান

দ্বিজেয় দত্ত
কলা, দ্বিতীয় বর্ষ

অবশেষে আজকে তুমি তার জবাব দিলে।

যখন এতটা পথ এগিয়ে এসে মৃদু মৃদু সমুদ্রের
গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছিলাম ঠিক সেই সময় মনে হল
আমার সমস্ত শক্তি ফুরিয়েছে সবটুকু ধৈর্য্য
নিঃশেষিত হয়েছে। আমার বুকের ভেতরটা হাহাকার
করে উঠল। আমি বললাম, আমি মুক্তি চাই।
বললামঃ অন্ততঃ এই কটা দিনের জন্য আমাকে
একলা থাকতে দাও।

অথচ সামনেই মহাজীবন। যেখানে আমি মিশব, যাকে
লক্ষ্য করে আমি হাঁটতে শুরু করেছিলাম। যাকে নিয়ে
রঙীন সংসারের স্বপ্ন দেখেছিলাম। যার জন্য আমি
খারাপ পথ থেকে ভালো পথে পা বাড়িয়েছিলাম।
এত তীব্র জ্বালা আর যন্ত্রণা সত্বেও যে মহাজীবনের
জন্যে আমি এতকাল সৃষ্টিশীল কাজ করবার চেষ্টা
করেছি।

যেদিন তাকে আমি প্রথম দেখেছিলাম
সেদিন আমার কোন বাধা ছিল না, ছিল না কোন
বন্ধন। আমি ছিলাম পাহাড়ি নদীর মত
উদাস, বেপরোয়া ছিলাম আমি। দু চোখে
ছিল আমার অফুরন্ত নেশা। ঠিক সেই সময়
তুমি এলে। আমি প্রথমেই চেয়েছিলাম তোমাকে
পেতে। জানি এটা আমার আশা। বুকের মধ্যে
দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করলাম। সংগ্রাম শুরু হল

এর বাতাসে তাজা রক্তের স্বাদ,
নতুন স্বাদে মানুষগুলো উন্মাদ,
চাই মুক্তি, চাই অন্ন বস্ত্র,
এ রব নতুন নয়, তবু এ ভাষা নবরূপে পেয়েছে জন্ম
এর দাবীতে ফেটে পড়েছে সমস্ত ভারতবর্ষ।
মানুষগুলো আজ আর বসে নেই
তারা আজ উন্মুক্ত পথের উপরে,
তারা আজ আগুন লাগা বারুদের মত
এই মুহূর্তে ফেটে পড়বে
তারপর জ্বলে উঠবে সমস্ত ভারতবর্ষ,
হয়ত সে আগুন জ্বলবে বছরের পর বছর।
হয়ত এখানে রূপ নেবে আর এক মুক্তিস্নাত জাতি,
পৃথিবীতে সৃষ্টি হবে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে
আর এক মুক্তি যুদ্ধ,
আর এক ইতিহাস সৃষ্টি হবে
রক্তের অক্ষরে লেখা হবে যে নাম,
বিশ্বের ভারতবর্ষ হবে আর এক ভিয়েতনাম।

●●●

যাদের চৈতন্য হয়েছে তাদের বেতালে পা পড়ে না, হিসাব করে পাপ ত্যাগ করতে হয় না, ঈশ্বরের উপর এত ভালবাসা যে, যে কর্ম তারা করে, সেই কর্মই সৎকর্ম। কিন্তু তারা জানে এ কর্মের কর্তা আমি নই, আমি ঈশ্বরের দাস।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

ভারত থেকে ভিয়েতনাম

দেবপ্রসাদ ঘোষ
বিজ্ঞান, দ্বিতীয় বর্ষ

কি ছন্নছাড়া নির্মম এই পৃথিবী।
এর প্রত্যেকটি ধূলিকণা পর্যান্ত হয়ে গেছে বিষাক্ত,
বাতাসে তাজা রক্তের বারুদের গন্ধ
দিকে দিকে চলেছে উন্মত্ত ধ্বংস লীলা
প্রত্যেকটা মানুষ পেয়েছে রক্তের সন্ধান
সবাই মাতালের মত মেতেছে,
প্রকৃতি এসে ধাক্কা দিয়েছে,
পারেনি তাকে সরাতে,
পারেনি তার হাত থেকে শাণিত ছুরিটা পর্যান্ত নামাতে।
হায়রে প্রকৃতি, এ-দিকে ভিয়েতনাম,
রক্তে লেখা যে নাম,
যে নাম করেছে ইতিহাস সৃষ্টি,
তাও রক্তের অক্ষরে।
বাকী নেই কম্বোডিয়া, লাওস,
দেখ গিয়ে তাদের গলির পথের কাঁকরগুলো পর্যান্ত লাল,
মিশর, আরব, ইস্রাইল থেমে নেই
ফসলের ক্ষেতগুলো পরিণত করেছে রণাঙ্গনে।
প্রয়োজনের তাগিদে,
সত্যই পৃথিবী, এই মানুষগুলো ব্যস্ত,
এদের প্রয়োজন মেটাচ্ছে আমেরিকা, রাশিয়া, চীন।
অত দূরেই বা যাই কেন বন্ধু,
আমার সুজল সুফলী ভারতবর্ষ
এর ক্ষেতে এখন নেই শস্য, এগুলো রণাঙ্গনের অংশ
পরিণত হয়েছে লাল মাটিতে,
এবার লাল মাটির শস্যে হবে নবান্ন।

SCHOOL DAYS

MALAY RANJAN LAHA
2nd Year B.A. (Houn.)
Section A, Roll 24, 1972

Stern days I had
In my little school
Made not me glad
Without making me fool.

Confined was than I
In my little school chamber
But now I am to lie
On the bed of moving everyhere.

Masters of the school who
Loved me much
Obeyed them I too
Now with them I've no touch.

Confinement won't come to me
But freedom in its stead
My mind is now full in glee
Those days are totally dead.

রাজপথ
ও
মেঠোপথ

রামমোহন ভট্টাচার্য্য
কলা, দ্বিতীয় বর্ষ

রাজপথ বলি ওঠে মেঠোপথে ডাকি,
ধুলায় ধূসর তুই রূপ তোর ফাঁকি।
মেঠোপথ কহে মিছে কর মোরে ঘৃণা,
তোমার দেহের আমি পূর্ব্বরূপ কিনা ?

জয় হইবে, ভারতবর্ষের জয় হইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা নিবাক, তাহারই জয় হইবে……।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ্যালিলিও, সক্রেটিস, যীশু ও একটি লোক

শৈবাল মজুমদার
বিজ্ঞান শাখা, দ্বিতীয় বর্ষ

তারপর,
গ্যালিলিও আমাকে বললেন,
"পৃথিবীটা ভীষণ অবিশ্বাসী।
এরা বৃত্তের পরিধি ধরে
অনন্ত যাত্রা শুরু করেছে।
পরিধির বাইরে যেতে
অভাবনীয় আতংক
এদের শিরায় শিরায়।
এরা, ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের
মত নৃশংস,
পৌরানিক পণ্ডিতের সংকীর্ণতা
এদের দেহের পলে পলে।"
আমি সক্রেটিসের
পায়ের তলায়
নতজানু হয়ে,
আমার হৃদয় সমীপেষু করলাম,
উদার হাসো
তিনি বললেন,
"দেখো, মানুষের দেওয়া
বিষের যাতনা
এখনো আমার
চোখের তারায় ছটফটাচ্ছে
অবরুদ্ধ যন্ত্রণায়।
আমি কি অসত্য ছিলাম?
গ্যালিলিও কি অসত্য ছিলো?
তবে কেন আমাদের
প্রাপ্য এই নির্মমতা?"
করুণ নয়নে বললাম,
"প্রভু, যীশুর উদারতায়
আমাদের ক্ষমা করো তুমি।"
"ক্ষমা করেছি"
মিলিয়ে গেলেন
গ্যালিলিও, সক্রেটিস, যীশু।

আবর্ত

শ্রীঅঞ্জন ব্যানার্জী
বিজ্ঞান, দ্বিতীয় বর্ষ

একটা কালো বৃত্ত—
মাঝখানে একটা আলোর বিন্দু।
বৃত্তের ধারে ধারে অসংখ্য পোকা
অঙ্কের মত আলো হাতরে বেড়াচ্ছে।
একবার আলোর ছোঁয়াচ লাগলে
ওরাও হবে ফুলঝুরি।
ঠিকরে দেবে, বিলিয়ে দেবে আলো
অসীম অন্ধকারে।
চেষ্টার ওদের অন্ত নেই
কিন্তু পারছে না, কিছুতেই পারছেনা।
অন্ধকারটা বারবার বাধা দিচ্ছে ওদের
হঠাৎ একটা পোকা ঝাঁপিয়ে পড়ল আলোর মধ্যে
তারপর নিজেই জ্বলতে লাগল।
তারপর আরো আরো পোকা জ্বলতে লাগল
তারপর সবাই—
শেষে বৃত্তটাই জ্বলতে লাগল
আলো ছড়াতে লাগল।

নূতনের স্বপ্ন

সূর্য্য কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
ভূতত্ত্ব, তৃতীয় বর্ষ

প্রচণ্ড একটা আনন্দ বুকে চেপে আমি বেঁচে আছি,
দুঃখের ঝড়ঝাপটাগুলো আমার আনন্দের শাখাটাকে আরও
জোর ঘোরাচ্ছে—
আমি জীবনটাকে চেটেপুটে খাচ্ছি।
বিশ্বাস-অবিশ্বাসের গুপ্ত ছুরি অহরহ চলছে,
কেবলই এদিকে ওদিকে হোঁচট খাওয়া—
চাপ চাপ জমাট রক্ত—আমার বেঁচে থাকা।
ছক বাঁধা জীবনের রাস্তায় বোকা বোকা জীবনের স্বপ্ন,
চারদিকে তুষের আগুনের পোড়া পোড়া গন্ধ
আগুনের তাপ লাগা জলুনি—আমার নূতনের স্বপ্ন।

আগত

পার্থসারথি সেনগুপ্ত
অর্থনীতি, দ্বিতীয় বর্ষ

ভগীরথের সেই-ই শঙ্খ ধ্বনি
আজও বেজে চলে শুনি
আকাশে মাটিতে, পাহাড় সমুদ্র ডিঙিয়ে—
তোমার আমার বুকেতে তার
জাস্তব প্রতিধ্বনি।
আমার ভারতবর্ষে,
ইন্দোচীনে অথবা ল্যাতিন আমেরিকায়
শোনা যায় তার ভবিষ্যৎ পদধ্বনি।
আশুতোষ কলেজ,
আমার অপাপবিদ্ধ ঘর সংসার ইত্যাদির
জানালার সূর্য্য লাজুক নত।

ভাবছি—

সে দুঃখ পাবে ?

না ?

পাবে সে স্বস্ফূর্ত আনন্দ।

আনন্দে সে অধীর হবে ; তার বুকটা

শক্ত।

সে নিরীহ নয়, সে দৃপ্ত।

যেন তার বুকের উপর দিয়ে বিপ্লব চলছে।

তবু ও—

তার আনন্দ

কি অপূর্ব সাত্ত্বিক।

ঐ লোকটা,
বলে, পৃথিবীটার রং
পাল্টানো দরকার,
ভীষণ পুরনো হয়ে গেছে।
এর পলস্তারায়, ঐতিহাসিক
কলঙ্কিত কালো রক্তের দাগ,
লোকটা বলে,
পুরনোকে কবরের
শান্তিতে বিশ্রাম দিয়ে,
নতুন ইমারৎ গড়ো।
প্রবীনের পচনের ওপর
নবীন প্রাণ ঘৃণাভরে
কুচমার্চ করুক।
মানুষ, নিদারুন হিংস্রতায়
লোকটার ওপর
ঝাঁপিয়ে পড়ে,
বলে, মূর্খ তোর শাস্তি
মৃত্যুদণ্ড।
লোকটা নিজের কথাই বলে,
এবং তারপর মানুষের
নির্মমতা ও একটি হত্যা।

জানি,
ভবিষ্যৎ মানুষের প্রতিনিধিকে,
আমারই মত বলতে হবে,
গ্যালিলিও, সক্রেটিস, যীশু এবং
হে লোক (তোমার নাম জানিনা)
তোমরা আমাদের ক্ষমা করো,
তোমাদের
চিনতে পারিনি আমরা
আমাদের ক্ষমা কর।

গল্প

সাত্ত্বিক

মানস কুমার জানা
বিজ্ঞান বিভাগ (জীব), দ্বিতীয় বর্ষ

রাজপথটা থাঁ থাঁ করছে—,
চায়ের দোকানগুলো প্রস্তুত হতে চলেছে
কয়লার ধোঁয়া—
রুট পাকাচ্ছে ,

সাইকেলের চাকা—
যায়,
সোঁ সোঁ শব্দে
সবধুলো ছড়িয়ে পড়ছে।

খুন, লুঠ, ডাকাতি, ভয়, বাহাজানি, সন্ত্রাস—
টুকি টাকি অনেক কথা।
পাশের দেবদারু গাছটা,
বসন্তকে সাজানোর লোভে,
পাতাগুলোকে ঝরিয়ে দিচ্ছে।

ঝাড়ুদার ?
বেশ কষ্ট করছে।
মিস্ মিসে শীত।
প্রভাত আগমনী, রজনী প্রীত ;
পাকটা শ্রীহীন,
কেন জান ?
দু-একটা গাছ থাকলে কি রূপ বাড়ে।

পথ অপেক্ষা করছে—
কত হাজার পদ চিহ্নে
কত হাজার চাকা গড়িয়ে যাবে।

অচেনা পথ

মাধব চন্দ্র সিংহসহেস রায়
কলা, দ্বিতীয় বর্ষ

এখান থেকে বহুদূরে—কতদূরে জানিনা, যেখানে ভয়াল হিমপ্রবাহ, শৈত্যের স্তব্ধতা আর নিটুর নীরবতার মাঝখানে নিষ্কম্প দীপশিখার মত রয়েছে ভারতীয় জোয়ানের দল। জননীর সম্মান রক্ষায় মরণের হাতছানিকে উপেক্ষা করে চলেছে সন্তানেরা। দার্জিলিং পেরিয়ে আসামের সীমারেখা পার হয়ে নিভৃত বনরাজি আর জনপদের বুকে অভয় মুর্তিতে জেগে রয়েছে হিমালয়, যেন চির প্রহরী। তারই পদদেশে ছোট্ট একটি পল্লী, উষ্ণ নরম আনন্দমুখর জনপদ। পাশে কল্লোলিনী ছোট্ট নদী। গাছপালায় ছায়াময়- ফাঁকে ফাঁকে গড়ে উঠেছে—দুই একটা আধুনিক ধরনের বাংলো। সম্মুখে প্রশস্ত রাজপথ—বৈদ্যুতিক আলো। যানবাহনের কোলাহলে মুখরিত।

ছোট্ট একটি বাংলো সামনে দেশী বিদেশী ফুলে ভরা ছোট্ট একটি বাগান, অস্তমান সূর্য্যের রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে বাগানের এখানে সেখানে।

হ্যাঁ—সবিতা! সর্ব্বরিক্তা সবিতা। অপূর্ব্ব যৌবনশ্রী নিয়ে সংসারের মধ্যে নিজেকে বন্দী করে রেখেছে। আরও আশা ছিল, লাবন্য ছিল—আজ কিছু নেই। একটা স্বপ্ন দেখা শিল্পীর সংসার-শিল্প রচনা করতে গিয়ে নিজেকে বলি দিয়েছে সে। সে আজ কত বছরের কথা।

উদীয়মান ইঞ্জিনীয়ার অসিত দত্ত। সবে পাশ করে এসে চাকরি নিয়েছে। উত্তাল কর্মচিন্তা যেন পাগল করে রেখেছে তাকে। অতুলনীয় স্নেহ আর ভালবাসা দিয়ে ঘিরে রেখেছে পতিব্রতা রমনী সবিতাকে। জীবনের তার সব শূন্যতাকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে সবিতার স্পর্শে—এক মুহূর্ত্তও সবিতাকে সে চোখের আড়াল করতে পারে না।

শীত আগত প্রায়—তারই আভাষ দূরের পাহাড় ঘেরা বনবীথিকার পল্লবের স্তরে স্তরে। সূর্য্যরশ্মি ম্লান—সূর্য্যদেব বুঝি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। চেয়ারে বসে সামনে রেডিও খুলে স্বামীর জন্য কাশ্মীরী উলে সোয়েটার বুনছে আর রেডিওর তালে তালে গুণ গুণ করে চলেছে সবিতা। 'সবিতা—সবিতা' শব্দে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ল অসিত। —এই দেখো সবিতা— কি এনেছি তোমার জন্য—। 'কৈ দেখি'—বলে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সবিতা অসিতের দিকে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
১০৮তম জন্মদিনে
স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

আশুতোষ গ্রুপ অফ কলেজ কর্মচারীদের পক্ষ থেকে—
শ্রীহরিহর প্রামাণিক

হে বরেণ্য,

তোমারে জানাই মোরা অন্তরের শত প্রণিপাত
তব জন্মদিনে আজি
মনে হয় তুমি আছ যাওনি হারায়ে কোথা
কাছে পাশে পাই যদি খুঁজি।

বাংলার মুকুটমণি, তুমি আশুতোষ
বাংলাদেশ তব মাতৃভূমি
রেখেছ মায়ের মান, দানিয়া কোমল প্রাণ
শত কণ্ঠে ওঠে একধ্বনি।

কোমল হৃদয় তব কাঁদিয়াছে চিরদিন
গরীবের তরে
সেই কান্না সাড়া দিল বাঙালীর
প্রতি ঘরে ঘরে।

শিক্ষার তৃষ্ণার্ত্ত দীপ জ্বালাইলে তুমি
তোমার জলন্ত দীপে, আলোকিত আজি
জন্মভূমি।

সবে ভোর হয়ে আসছে—ভোরের পাখীরা কলরবে ব্যস্ত। দূরে সানাই-এর সুর ভেসে আসছে—দরবারী কানাড়া রাগে সানাই ভোরের পৃথিবীকে শোকমগ্ন করে তুলেছে—মনকে করে তুলছে বেদনাতুর। সবিতা ছুটে চলেছে—হঠাৎ রাজপথের মোড় ফিরতেই তীব্র বেগে ছুটে এসে পড়ল একটা কয়লা বোঝাই ট্রাক। জ্ঞান হারিয়ে ফেললো সে। রক্ত পড়ছে মুখ দিয়ে—রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে সারাটা দেহ। ড্রাইভার তাকে তুলে নিয়ে সামনের হাসপাতালে নিয়ে চললো। ডাক্তারের চিকিৎসাকে অবহেলা করে, নার্সের সেবাকে বিফল করে কাঁপতে কাঁপতে শুধু বলল, 'অসিত—অসিত জানিনা তুমি কতদূরে—জানিনা তুমি শুনতে পাবে কিনা—আমি তোমার পথে পা বাড়িয়ে নিজের পথ খুঁজে নিলাম।" তারপর সব শেষ।

মুহূর্ত্তের তরে ভয়ালগিরি কন্দর থেকে পিছন ফিরে দেখলে দেখা যেত দীনতায়, শোকে, দুঃখে, ক্ষোভে যেন নিলিপ্ত হয়ে পড়েছে—ঐ বনরাজি ঐ শৈল চূড়া।

লোকে পরিশ্রম করিবেনা, একে অপরকে প্রতারণা করিবে, এইজন্য যদি তাহাদের মৃত্যু হয়, উহা হইবে স্বাগত মুক্তি। বাকী সকলে তখন শিক্ষা লাভ করিবে এবং অলসতা, কুড়েমি কিংবা স্বার্থপরতার পুণরাবৃত্তি করিবে না।

মহাত্মা গান্ধী

...... ক্রমাগত।

নিরুৎসাহ হয়ে পড়লো সে। ঘাড় থেকে ঝাকড়া মাথাটা বৃদ্ধের মত ঝুলে পড়ল। বিছানায় ...র ঘরের দেওয়ালের দিকে ঠায় তাকিয়ে থেকে ওর মনে হ'ল দেওয়ালের নিখুত উদাস ...ঃ ডুবে যাচ্ছে। এইভাবে—ঠিক এইভাবে শঙ্করের স্মৃতি বাস্তব এক গভীর নির্লিপ্ত শাদায়

This is the way the world ends.
Not with a bang, but a whimper.

পকেট থেকে অসিত বের করলো সবুজ মোড়কে ঢাকা এক জড়োয়া নেক্‌লেস্‌, পরিয়ে দিল সবিতার গলায়।

বাঃ— কি সুন্দর মানিয়েছে তোমায়। কেন?— আমি কি দেখতে খারাপ নাকি। না—না সে নয়— এই নেক্‌লেস্‌টার জন্য তোমার সৌন্দর্য্যটা আরো বেড়ে উঠেছে। নয় কি?

এমনই ভাবে হাসি আনন্দে কেটে যাচ্ছিল সবিতা আর অসিতের জীবন। কোনও সন্তান সন্ততি নেই তাদের। ভাল চাকুরী—মাইনে যা পায় তাতে দুজনের বেশ উদ্দাম স্রোতে বয়ে যায় বৎসর।

কালের চাকা ঘুরে যায় নিত্যনৈমিত্তিক। কোন বাধা মানেনা সে মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার।

ধীরে ধীরে প্রৌঢ়াবস্থা নেমে আসে তাদের জীবনে। চাকুরীর কর্ম্মচাপে অত্যধিক মদ্যপান হেতু মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয় ইঞ্জিনীয়ার অসিত দত্ত। কাশতে কাশতে বেরিয়ে পড়ে রক্ত। প্রথম প্রথম সে ধরা দেয়নি— এমনকি সবিতার কাছেও চাপা দিতে চেষ্টা করেছিল। সুখের চেয়ে দুঃখের সংবাদ এ পৃথিবীতে এমনই করে অত্যন্ত অযাচিতভাবে এসে পড়ে মানুষের কাছে। জ্বর আসতে থাকে প্রায়ই—চাকুরীতে পড়ে যায় ইস্তফা। সবিতার সৌন্দর্য্যও স্তিমিত হয়ে এসেছে। ক্রমাগত স্বামীর শিয়রে রাত জাগায় দেহ হয়ে পড়েছে শীর্ণ। দেখতে পারছে না অসিত সবিতার এই কষ্ট। মনে মনে সে নিজেকে, পৃথিবীকে ধিক্কার দিতে লাগলো।

"প্রিয়া,

আমার দুঃখপূর্ণ জীবনে তোমায় দুঃখ দিতে আমি পারবো না। আমি বেরিয়ে পড়লাম। আমি হারিয়ে পড়লাম, কোথায় যাবো জানিনা—হয়তো বা আর কোনদিন ফিরবো না—হয়তো বা এই হল শেষ দেখা। বেঁচে থেকে এভাবে তোমার দুঃখ আমি দেখতে পারবো না। তুমি সব জিনিষপত্তর নিয়ে বাপের বাড়ী চলে যেও— তুমি আমায় ক্ষমা করো।" সবিতার উদ্দেশ্যে এই পত্রটা লিখে রাখল অসিত।

বাড়ী থেকে রাত্রিবেলায় হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে অসিত। কাঁপতে কাঁপতে সে রাস্তাধারের টিম্‌টিম্‌ করা বিজলী বাতিটার কাছে এসে পড়লো। হঠাৎ এক ঝলক রক্ত বেড়িয়ে পড়লো তার মুখ থেকে। সামনে রেললাইন··· গভীর নিস্তব্ধতাকে ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ করে চলেছে দানবীয় শক্তি। যেন দুটো অচেনা হাত তাকে হাতছানি দিচ্ছে ঐ লৌহদানবের আকর্ষণে। তার হুঁশ রইলো না। লাইনের ওপর সোজা উঠে এল। মনের মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষ চলছে সবিতার ভবিষ্যৎ--নিজের পরিণাম। হঠাৎ একটা মালগাড়ী ঝক্‌ঝক্‌ শব্দে হাঁপাতে হাঁপাতে চলে এলো। চেতনা ফিরে পেল অসিত। তাড়াতাড়ি ওঠার চেষ্টা করলো—কিন্তু না; ততক্ষণে রেল গাড়ীটা অসিতকে ফেলে চলে গেছে অনেক দূরে—রক্তে রাঙ্গা হয়ে গিয়েছে লাইনের সাদা পাথরগুলো।

দুঃস্বপ্ন দেখে চীৎকার করে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়েছে সবিতা। সামনে রাখা চিঠিটার দিকে নজর পড়লো। উপরে বড় বড় হরফে লেখা আমি চললাম—তুমি আমায় ক্ষমা—হাঁ—ক্ষমা করো।" নিথর হয়ে গেল তার সারাটা দেহ। আদ্যোপান্ত তাড়তাড়ি পাঠ করলো সেটা। এলোমেলো ভাবে খুঁজতে লাগল চারিদিকে— হাঁপাতে হাঁপাতে বেড়িয়ে পড়লো রাস্তায়। সামনে যক্ষ্মা হাসপাতালে। খোঁজ করলো—কিন্তু না—"যে যায় সে অনন্তকালের জন্যই যায়।" কেশ বেশ তার অসংযত—মরিয়া হয়ে উঠেছে—পাগল হয়ে উঠেছে সবিতার সারাটা মন।

ধরা নাহি দেব

স্বপন কুমার দে
কলা, দ্বিতীয় বর্ষ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তাক্ত দিনগুলিতে অসংখ্য তাজা প্রাণ অকালে ঝরে পড়েছিল। কত বীর দেশপ্রেমিক লোক চক্ষুর অন্তরালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন ইতিহাসের পাতায় হয়ত তাঁদের কীর্তিগাথা সোনার অক্ষরে লেখা নেই। লেখা নেই তাঁদের মহান আত্মোৎসর্গের অমর কাহিনী। তবুও তাঁরা জাতির ইতিহাসে চির-স্মরণীয়, চির-বরণীয়। তাঁদেরই মতন একজন, বাঙালী বিপ্লবী নলিনী বাগচি, যাঁর বীরত্বপূর্ণ আত্মদানের কথাই এবার শোনাতে চাই।

বৃটিশ শাসনাধীন ১৯১৭ সালের এক নিশা। গৌহাটির এক জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে বাংলার ফেরারী বিপ্লবীদের গোপন ঘাটিতে গোরা পুলিশ অতর্কিতে ঝাপিয়ে পড়ল। নৈশ নিস্তব্ধতাকে খানখান করে একসাথে মুহুর্মুহুঃ গর্জে উঠল পুলিশের রাইফেল। পালটা জবাবে বিপ্লবীদের আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ক্ষণে ক্ষণে অনল উদ্গার হতে লাগল। বহুক্ষণ ধরে দু'পক্ষে চলল হার-জিতের এক তীব্র সংগ্রাম। বিপ্লবীদের গুলি-বারুদের পরিমাণ সীমিত। ঘাঁটির চারপাশ ঘিরে আছে সশস্ত্র গোরা পুলিশ বাহিনী। তাদের বিরুদ্ধে সীমিত শক্তি নিয়ে কতক্ষনই বা লড়াই করা যায়! ফলে এক সময় ধীরে ধীরে বিপ্লবীদের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি স্তব্ধ হয়ে এলো। আত্মোগোপনকারী বিপ্লবীরা প্রাই সবাই আহত অবস্থায় একে একে ধরা পড়ল পুলিশের হাতে। কিন্তু বিপ্লবীদের মধ্যে দু জন পুলিশের চোখকে ফাকি দিয়ে, পুলিশ ব্যূহ পেছনে রেখে রাত্রির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। এই দুর্ধর্ষ ফেরারী বিপ্লবীদ্বয়ের একজন হলেন, নলিনী বাগচি। পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে এঁরা পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পায়দলে কলিকাতার পথে যাত্রা করলেন।

কিন্তু কলিকাতায় পৌঁছে আকস্মিক ভাবে বিপ্লবী নলিনী বাগচী বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। তাঁর জীবনের এক নিঃসঙ্গ অবস্থায় পাশে এসে দাঁড়ালেন বাংলার বিপ্লবীরা। তাঁদের অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষায় তিনি অচিরে আরোগ্যলাভ করলেন।

সেই সময়ে পুলিশী অত্যাচারে, নির্যাতনে বাংলার বৈপ্লবিক শক্তি ও সংহতি বিচ্ছিন্ন। এই সংবাদে বিপ্লবী নলিনী বাগচি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এবং প্রতিবিধানের পথ খুঁজতে লাগলেন।

সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার আগেই তিনি কলিকাতা থেকে ঢাকায় রওনা হয়ে যান। সেখানে ফেরারী বিপ্লবী নলিনী বাগচী কলুতা বাজার এলাকায় বিপ্লবীদের এক গোপন আস্তানা গড়ে তুললেন। এই সময়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান বিপ্লবী তারিণী মজুমদার।

কিন্তু কালক্রমে গোয়েন্দা পুলিশ ঢাকায় বিপ্লবীদের এই গোপন আস্তানার খোঁজ পেল। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হঠাৎ এক রাত্রে বিরাট পুলিশ বাহিনী এই আস্তানা ঘেরাও করল। ঘটনার আকস্মিকতায় বিপ্লবী নলিনী বাগচি ও

অবেলায়

সৌমিত্র বসু
বিজ্ঞান, তৃতীয় বর্ষ

জানলার বাইরে উদাস আকাশ। নীচে এক টুকরো জমি, যার কোণে একটা কাঁকড়া গাছ দাঁড়িয়ে আছে। গাছের পাতার গা বেয়ে আলোর সুতো রোদ্দুর হয়ে মাঠে ছড়িয়ে পড়ছে। মাঠ, গাছ, আকাশ ইত্যাদিতে অন্যমনস্ক থেকে শংকর ওর হাতের ব্যথাটা ভুলতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু ওর সমস্ত অন্যমনস্কতাকে গিলে নিয়ে যন্ত্রনাটা হাত ছাপিয়ে ক্রমশ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। বর্ষাদিনের বৃষ্টির মত কখনও ঝমঝম করে আবার কখনও বা টিপ্‌টিপ্‌ করে ঝরছে। কিন্তু বৃষ্টির বিরাম নেই। ঘাড় ফিরিয়ে ঘরটা একবার দেখে নিল শংকর। সদ্য চুনকাম করা নিখুঁত সাদা দেওয়াল। পাশে বইয়ের র‍্যাক একটা, ওপাশে চেয়ার টেবিল ইত্যাদিতে শিক্ষক হিরণদার বাহুল্যহীন অভিজাত রুচির ছাপ ঘরের সবখানে ছড়িয়ে আছে। মুখোমুখি দেওয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার ঝুলছে—নিসর্গ দৃশ্য। কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্য্যোদয়। শংকরের মনে পড়লো, সদ্য গ্র্যাজুয়েট হয়ে ওরা চার বন্ধু দার্জিলিং-এ বেড়াতে গিয়েছিল। সেদিন কুয়াশা পড়েছিল খুব। তারপর কখন যেন কুয়াশা সরে গিয়েছিল, ওদের মনের তাৎক্ষনিক উচ্চাশা, স্বপ্ন-আকাঙ্খার মত রঙিন আলো কাঞ্চনজঙ্ঘার উপর তিরতির করে ছুটছিল।

শংকরের মনে হলো ওর বাজপড়া রোগা ঝলসানো গাছের মত হাতটায় যেন হাজার ছুঁচ ফুটছে ক্রমাগত। নিজের ওপর রাগ হয়ে গেল ওর। এক মুহূর্ত্তের অসাবধানতা, শুধু এক মুহূর্ত্তের অন্যমনস্কতা ভোলবার জন্য এখন অনামনস্ক হওয়ার কি প্রচণ্ড চেষ্টা করতে হচ্ছে তাকে। ঝপ্‌ করে ঘটনাটা মনে পড়ে গেল ওর। গ্যাসপোষ্টের টিম্‌টিমে আলোয় একটা প্রায় অন্ধকার গলি····· খোঁয়াড়ে বন্ধ হাজার শুয়োরের চিৎকার····· মার খেয়ে ছুটছে শুয়োররা— নিজের হাতে ধরা রোম চামড়া, মাংস ছিড়ে, ঝলসে ফেটে পড়লো প্রচণ্ড শব্দে। শংকরের মাথার মধ্যে দিয়ে একটা মালগাড়ী—গমগম রব তুলে ওভারব্রীজ পার হয়ে গেল। আহত, তৃষ্ণার্ত শংকর প্রাণপণে ছুট্‌তে লাগল। তারপর কখন যেন হিরুদার বুকে এলিয়ে দিল ওর ক্লান্ত বিক্ষত শরীরটা। ধোঁয়া, ধোঁয়া আচ্ছন্নতার মধ্যে একসময় মনে পড়লো ওর শরীরে কোন ক্ষত নেই, কোন যন্ত্রণা নেই। আজ কোথাও মারপিট হয়নি, বোমা ফাটেনি। আজ সন্ধ্যেবেলা আকাশ লাল হয়ে মেঘ জমেছিল। বাবা পরিশ্রান্ত হয়ে অফিস থেকে বাড়ী ফিরেছিলেন, বাইরে ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল বন্ধ জানলার গায়ে হাওয়া বৃষ্টি আছড়ে পড়ছিল, ছোট্ট শম্ভু তার বাবার কাছে বসে সুর করে রিডিং পড়ছিল। বন্ধ ঘরের হলুদ আলো শান্তির জল হয়ে ঝরে পড়ছিল·····

মাঝরাতে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে শংকর দেখছিল চশমার মোটা কাঁচের মধ্যে হিরুদার মমতাময় একাগ্র দৃষ্টি ওর শরীরে স্থির। বাবাকে মনে পড়ছিল শংকরের, মৃত বাবাকে। ওয়েলডিংয়ের ব্লু ল্যাম্পের মত নীলচে সাদা আলো ক্রমশ ওর মাথায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল। হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো শংকর। লাথি লেগে টুলের ওপরের কাঁচের

মৃতের ভোজ

শুভেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃতীয় বর্ষ, সাম্মানিক ইংরেজী

[আধুনিক তুর্কী সাহিত্যিকদের মধ্যে কেভ্‌ডেৎ কুড্‌রেৎ-এর নাম একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে। লেখকের জন্ম ইস্তানবুলে—১৯০৭ সালে। সাহিত্যে প্রথম আত্মপ্রকাশ কবি ও নাট্যকাররূপে, যদিও বিগত দুই দশকে তিনি মূলতঃ উপন্যাসই লিখেছেন। ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রেও তিনি সমদক্ষ। বর্ত্তমান গল্পটি তাঁর একটি বিখ্যাত ছোটগল্পের ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে রচিত।]

শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের রং গেল পাল্‌টে। ধূসর আকাশের নীচে পৃথিবীর চেহারা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠলো। অন্ধকারে-পিছিয়ে-থাকা রাস্তাগুলো আজকাল প্রায় খালিই পড়ে থাকে। মস্‌জিদের প্রাঙ্গণে এখন কাউকেই দেখা যায় না, শিমুল গাছের শীতল ছায়া-ঘেরা পরিবেশে এখন আর কাউকেই চোখে পরে না, গ্রীষ্মের পড়ন্ত বিকেলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেখানে এসে জমায়েত হয়, সেই শিশু-উদ্যানেও আজ কেউ নেই। কুয়োতলাটা কখনই সম্পূর্ণ জনবিরল থাকে না, প্রায় সব সময়েই কেউ না কেউ এসে সারাদিনের ব্যবহারের জল নিয়ে যায়, কিন্তু তাও আজ খাঁ খাঁ করছে।

প্রতিদিনের মতো আজ দুপুরেও ছেলেটি কুয়োতলায় জল তুলতে এসেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই ত্রস্ত দৌড়ে রাস্তায় ফিরে গেল। রাস্তায় নেমে যাকে প্রথমেই দেখতে পেল, সে বৃদ্ধ হোসেন আলী, তাকে বললো, "জানো, জানো" তখনও রীতিমত হাঁপাচ্ছে সে, "দর্শন আগা মারা গেছে!"

"মারা গেছে?"

"হ্যাঁ," বলে পরবর্ত্তী প্রশ্নের অপেক্ষায় আর দাঁড়ালো না ছেলেটি, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেল বাড়ীর দিকে।

দর্শন আগাকে এ-অঞ্চলের সকলেই চেনে। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, কিন্তু এখনও মুখভর্তি ঘন কালো দাড়ি। তাতে সহজেই বোঝা যায়, লোকটি শক্তসামর্থ্য। কুয়ো থেকে জল তুলে সেই জল বাড়ী বাড়ী যোগান দেওয়াই হ'লো তার জীবিকা। তার ছোট্ট ঘর; তাতে লোক বলতে থাকে স্ত্রী গুলনাজ আর তার ছোট দুটি ছেলে,—জামাল আর কামাল। দর্শনের যা কিছু সম্পত্তি, যা কিছু মূলধন, তা' হ'লো, দুটো টিনের ক্যানেস্তারা, আর দু'প্রান্তে লোহার শিকল আট্‌কানো একটা শক্ত লাঠি। প্রতিদিন ভোরে, যখন পাখীরা তাদের কলকাকলি সবেমাত্র শুরু করেছে কি করেনি, দর্শন তার লাঠিতে আট্‌কানো শিকল দুটোর সঙ্গে ক্যানেস্তারা দুটো ঠিকমতো লাগিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে, তারপর শুরু করে তার সেই চিরাচরিত ডাক, "জ-ল চা-ই জ-ল?"

অপরাহ্ণ অতিক্রান্ত

বিপ্লব রায় চৌধুরী
বিজ্ঞান, দ্বিতীয় বর্ষ

ঝিমঝিম শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল অয়নের। জানলার বাইরে তখন ধূসর চাদর। কাঁচের শার্সীতে মাথা কুটছে হাজার রূপোর তীর। ভোরের নীল স্বপ্নে অয়ন যখন কোন এক শ্বেত পাথরের ঠাণ্ডা ঘরে এক অপরূপ নারীর শাঁখ সাদা কপালে কাঁচপোকার টিপ রাখছিল। তখনই বৃষ্টির ঝিমঝিম শব্দ শুনল সে। অয়নের ভোরের স্বপ্ন। কিংতুড়ির পাহাড়, বন, বৃষ্টি, বাস্তব সব একাকার হয়ে গেল।

তবু ওর ভোরের স্বপ্নটাকে জোড়া দেওয়ার জন্য আবার ঘুমিয়ে পড়ল অয়ন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলে কোথায় যেন বিকট শব্দে পাথর ভাঙ্গা হচ্ছে। স্বপ্নের মধ্যেই জেগে উঠলো সে। এইভাবে অয়ন ক্রমাগত স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন দেখল। ও জেগে উঠল। তারপর একসময় বাস্তবিকই জেগে উঠে দেখল বৃষ্টি থেমে গেছে। নরম আলোর ঝরণায় দূরের পাহাড়—বনে শান্ত শ্রী। চায়ের দোকানে এসে বসল অয়ন।

কাছাকাছি পৃথিবীর যাবতীয় সুষমা স্থির। এক সময় ফুলের মত দুটো বাচ্চা ছেলে-মেয়ে অয়নকে একলা ফেলে লাফাতে লাফাতে ঢাল বেয়ে নেমে গেল। তাদের সঙ্গে এক মহিলা। এই স্থির সুষমার মাঝখানে সেই আশ্চর্য্য সুন্দর মহিলাকে চিনতে পারল অয়ন। হয়ত শারীরিক পরিবর্ত্তন ছিল অনেক, কিন্তু তার মুখের লাবণীতে কোন তফাত ছিল না। এইভাবে ক্রমে অয়ন তার ছেলেবেলায় ফিরে গেল।

বৃত্তাকার বাগানের মধ্যে একটা ছোট্ট গোলাপী বাড়ীতে থাকত টিংকু। রোজ বিকেলে স্কুল ছুটীর শেষে ওরা দুরে কোথাও বেড়াতে যেত। হয়ত কোন বড় মাঠে ছুটোছুটি করতো। কখনও এক বৃদ্ধ কসাইয়ের ছোট্ট ঘরের দোর গোড়ায় বসে রাজারাণীর গল্প শুনতো। নদীর ধারে মাঝির গান ছিল ওদের খুব প্রিয়। এইভাবে যখন পৃথিবীর অন্যান্য শিশুদের মত মাঠ, নদী, ফুল, রামধনু ইত্যাদিতে ওদের ছেলেবেলা কাটছিল সেই সময় এক ক্লান্ত বিকেলে খুব বৃষ্টি এলো। বৃষ্টি ভিজে বড় মাঠ পার হতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেল। তারপর একসময় এক গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ওরা দেখল ফুলের উপত্যকায় গোলাপী বাড়ীটা একাকী ভিজছে। ফুল এবং মাটির গন্ধ, বৃষ্টির শব্দ একটানা .....

চায়ের দোকান থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল অয়ন।

দৌড়ে গিয়ে ভদ্রমহিলার মুখোমুখি হলো এবং বহুবছর পরে এক বৃষ্টি ধোয়া পাহাড়ী পথে নিজেদের আবিষ্কার করে স্বাভাবিক ভাবেই অত্যন্ত খুশী হলো তারা।

এক সময় বৃষ্টি এলো আবার।

বাচ্চা ছেলে-মেয়ে দুটি বৃষ্টিতে ভিজে ছুটতে লাগল। বারবার ডাকল তাদের টিংকু। কিন্তু তারা ফিরল না। কিছুতেই ফিরল না। হঠাৎ হেসে ফেললো টিংকু এবং এই মুহূর্ত্তে নিজেকে দুঃখী মনে হলো অয়নের, অত্যন্ত দুঃখী।

মুসলমানদের মধ্যে একটা রীতি প্রচলিত আছে। কোন বাড়ীতে কেউ মারা গেলে দিনকয়েকের জন্য প্রতিবেশীরা পালা ক'রে সেই বাড়ীর লোকজনদের খাওয়ার ভার নেয়। গুলনাজ আর তার ছেলেদের জন্য প্রথম খাবার এলো রাস্তার ও ধারের বিরাট জমিদার বাড়ী থেকে। দর্শন মারা যাবার পরদিন দুপুরে জমিদার বাড়ীর চাকর একটা বিরাট ট্রে-তে ক'রে খাবার নিয়ে এলো গুলনাজের ঘরে। ট্রে-তে আলাদা আলাদা প্লেটে ছিল পোলাও, মুরগীর মাংস, পাঁউরুটি, টম্যাটোর সস্ আর তার সঙ্গে নানারকমের মিষ্টি।

সত্যি কথা বলতে কী, সেদিন কেউই খাওয়ার কথা ভাবেনি। কিন্তু ট্রে-র ঢাকা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই তারা একে একে টেবিলের পাশে এসে বসলো। এই ধরনের খাবার তারা আগে কখনও খায়নি বলেই হয়ত জমিদার বাড়ীর পাঠানো খাবার তাদের অমৃত বলে মনে হলো। দুপুরের মতো রাত্রেও সেদিন তারা খাবার টেবিলের কাছে এসে জড়ো হলো।

পরের দিন আরেকজন প্রতিবেশী তাদের খাবারের ভার নিলো। এইভাবে চললো তিন থেকে চারদিন। অবশ্য শেষের দিকের খাবার কোনটাই জমিদার বাড়ী থেকে পাঠানো খাবারের মত সুস্বাদু নয়। তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, খাবারগুলো গুলনাজের বাড়ীতে তৈরী খাবারের চেয়ে অনেক ভালো। কিন্তু এভাবেই যদি দিনের পর দিন চলতো, তাহলে গুলনাজের আর কোন ভাবনাই থাকতো না। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খাবার আসা যখন বন্ধ হলো, তখন তারা সহজেই বুঝলো, তাদের চরম দুঃখের দিন আগতপ্রায়।

যেদিন প্রথম খাবার আসা বন্ধ হলো, সেদিন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, তবু তারা আশায় বুক বেঁধে রইলো। রাস্তার ধারের প্রতিটি শব্দে সচকিত হয়ে উঠতে লাগলো। ভাবলো, এই বুঝি দেখা যাবে সাদা চাদরে ঢাকা সেই বিরাট ট্রে-টা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। কিন্তু এর বদলে দেখা গেল, সাধারণ মানুষ হেঁটে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে, তাদের শূন্য নিরালম্ব হাত কাঁধ থেকে ঝুলছে। রাতেও যখন খাবার এলো না, গুলনাজ বুঝলো, আবার আগের মতো তাকে নিজেকেই রান্না করে খেতে হবে। এই ক'দিনে তারা যে ধরনের খাবার খেয়েছে, তার সঙ্গে তার নিজের রাঁধা আলুর তরকারী আর রুটির কোন তুলনাই হয় না। তবু উপায় কী? শূন্য পেট বার বার মোচড় দিয়ে উঠছে। অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালো সে। কিছু আটা, মাখন আর আলু তাদের ঘরেই ছিল। তাই দিয়ে সেইদিন আর ক'টা দিন বেশ ভালভাবেই চালিয়ে নিলো সে। কিন্তু তাও একদিন ফুরিয়ে গেল। তখন ঘরের আনাচে কানাচে যা কিছু খুঁজে পেল, তাই খেতে আরম্ভ করলো,—তিনটে পিঁয়াজ, দুটো রসুন, একমুঠো শুকনো বরবটি। শেষপর্যন্ত এমন একদিন এলো যেদিন ঝুড়ি, বাক্স, তাক সমস্তই শূন্য হয়ে গেল। সেইদিনই প্রথম তারা খালি পেটে রাত্রে শুতে গেল।

পরদিন একইভাবে কাটলো। পড়ন্ত বিকালে ছোট ছেলে কামাল কাঁদতে আরম্ভ করলো, "মা, পেটের মধ্যে কেমন যেন করছে।"

মা বললো, "চুপ কর, কিছু একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে।"

তিনজনেই অনুভব করলো, তাদের পেট যেন কচি শিশুর কব্জির মতো ছোট হয়ে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে গেলেই মাথা ঘুরে যাচ্ছে, তার থেকে বরং উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়াই ভালো। শুয়ে থাকতে থাকতে তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল বিচিত্র রঙের খেলা—লাল, নীল, সবুজ আরও কত কী! সেই সঙ্গে কানের কাছে শুরু হলো গোঁ গোঁ শব্দ। তারা বুঝতে পারলো, তাদের কণ্ঠস্বর ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে।

তারিণী মজুমদার পালাবার কোন সুযোগই পেলেন না। পালাবার সব পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। জীবনের পরোয়া না করে আসন্ন বিপদের জন্য প্রস্তুত হলেন। তাঁদের ইচ্ছে ছিল গুলি চালিয়ে যাবার পথ তৈরী করে নেবেন। কিন্তু তারও উপায় নেই। এই ঝুঁকি নেওয়ার অর্থ স্বেচ্ছায় ধরা দেওয়া। না, একাজ তাঁরা প্রাণ থাকতেও করবে না। বাধ্য হয়ে বিপ্লবীদ্বয়কে অন্য পথ নিতে হোল। তাঁরা এক বিপজ্জনক পরিকল্পনা করলেন।

গোপন ঘাঁটির অভ্যন্তরে দু'টি মাত্র প্রাণী। অন্যদিকে এঁদের ধরবার জন্য অন্ধকারে লুকিয়ে আছে বিরাট গোরা পুলিশ বাহিনী। ওরা ভেবেছে বিপ্লবীদের গোপনঘাঁটিতে অনেক রাজদ্রোহী আত্মগোপন করে আছে। তাই তারা আটঘাট বেঁধে আসরে নেমেছে। গোপন পরিকল্পনা অনুসারে সহসা গর্জে উঠল বিপ্লবীদ্বয়ের আগ্নেয়াস্ত্র। সঙ্গে সঙ্গে একজন হাবিলদারের মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। প্রত্যুত্তরে ঝাঁকে ঝাঁকে ধেয়ে এলো রাইফেলের বুলেট। আচম্বিতে একটি বুলেট বিপ্লবী তারিনী মজুমদারের গায়ে এসে বিঁধল। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তিনি বীরের মৃত্যু বরণ করলেন।

সহকর্মীর আকস্মিক মৃত্যুতে বিপ্লবী নলিনী বাগচি মনে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। তবুও নিজের উপর আস্থা হারাননি। জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এবার তিনি সম্পূর্ণ একা। অন্যদিকে বিরাট পুলিশ দল। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও বিপ্লবী নলিনী বাগচি পিস্তল থেকে মুহুর্মুহু গুলি চালাতে লাগলেন। তাঁর অব্যর্থ নিশানা প্রতিপক্ষের অনেকের ভবলীলা সাঙ্গ করল। পুলিশের গুলিতে তিনি নিজেও মারাত্মক ভাবে আহত হলেন। তবুও গুলি চালিয়ে যেতে লাগলেন। সারা দেহে গুলি লেগে অজস্র ধারায় রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এদিকে তাঁর পিস্তলও শেষবারের মত অগ্ন্যুৎগার করে স্তব্ধ হোল। অত্যধিক রক্তপাতে ভীষণভাবে আহত বিপ্লবী নলিনী বাগচি ক্রমেই দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন। প্রতিপক্ষের গুলিবর্ষণ থামতেই সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী আস্তানায় প্রবেশ করল। ফেরারী বিপ্লবী নলিনী বাগচি পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন। তখনও তাঁর পিস্তল বজ্রমুষ্টিতে আবদ্ধ।

গ্রেপ্তারের পর আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনি পুলিশী তত্ত্বাবধানে হাসপাতালে নীত হন। মহান দেশপ্রেমিকের জীবনে আসন্ন সন্ধ্যার পূর্বাভাষ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। সেখানেও পুলিশ তাঁকে রেহাই দিল না। আসন্ন মৃত্যুর কোলে চলে পড়বার মুহূর্তগুলিতে পুলিশ বিপ্লবীর পরিচয় জানবার জন্য প্রশ্নবানে তাঁকে জর্জরিত করে তুলল। তারা বীর বিপ্লবীকে নিশ্চিন্ত মৃত্যুর অবকাশও দিতে রাজী নয়। কিন্তু মৃত্যু পথযাত্রী মহান বিপ্লবীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করেও তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও বের করতে পারেনি। তিনি জানতেন পুলিশ তাঁর পরিচয়ের সূত্র ধরে পলাতক বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করবে। মৃত্যু দুয়ারে জেনেও তিনি ধীর, স্থির, নির্ভীক!

ধরা নাহি দেব—এই পণ করেই যেন আত্মপরিচয় গোপন রেখে, পুলিশের সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করে, শুধু এই কথা বলে তিনি চির নিদ্রায় শায়িত হলেন—'Let me die in peace'

এই ভাবেই ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে এক বীর সৈনিক দেশমাতৃকার পাদমূলে জীবন অর্ঘ্য দিলেন। আমরা এই বীর শহীদের প্রতি জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মনে মনে যে সাহসটুকু সে সঞ্চয় করেছিল, তা নিমেষের মধ্যেই হারিয়ে গেল। তার কণ্ঠ থেকে একটি শব্দও উচ্চারিত হলো না। শুধু নির্নিমেষ নয়নে সে চেয়ে রইল বিশাল ঝুড়ি দুটোর দিকে। তার চোখের সামনে দিয়েই রুটির গাড়ীটা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘোড়াটা তার সাদা লম্বা লেজটা রুমালের মতো নাড়াতে নাড়াতে চলে গেল, যেন তাকে বলে গেল, "বিদায়, গুলনাজ! বিদায়!"

দরজা বন্ধ করে ঘরে ফিরে এলো গুলনাজ। তার ছেলেদের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে দাঁড়াতে এখন আর সে ভরসা পাচ্ছে না। শূন্য হাত দুটো লুকিয়ে রাখবার মতো সামান্য জায়গাও আজ তার জানা নেই। ছেলেরা কিছুই বললো না, শুধু মায়ের খালি হাতের দিকে তাকিয়ে তাদের মুখ ঘুরিয়ে নিলো। কোণের শূন্য চেয়ারটায় ধপ্ করে বসে পড়লো গুলনাজ। হাতদুটো চাদরে ঢাকা, পা দুটোও কাপড়ের মধ্যে গোটানো।—ছেঁড়া কম্বলের স্তূপের মতো লাগছে তাকে। কঠিন নিঃস্তব্ধতা ঘরের পরিবেশকে আরও অসহনীয় করে তুলেছে। আধ ঘণ্টা কী তারও বেশী সময়ের জন্য কেউ এতটুকু নড়ে চড়ে বসল না। অবশেষে ছোট ছেলে কামালই আবার নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করলো, তার বিছানা থেকে সে ডেকে উঠলো, "মা, মা!"

নির্লিপ্ত স্বরে মা উত্তর দিল "কী?"

"আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, আমি আর পারছি না মা, পেটের মধ্যে কেমন যেন করছে।"

শান্ত গলায় গুলনাজ বলল, "অবুঝ হসনে! ও কিছু নয়, খিদের জন্য এরকম হচ্ছে, এঁখুনি ঠিক হয়ে যাবে।"

"আমি মরে যাবো মা, আমি মরে যাবো।" বলেই চুপ করে গেল সে।

জামাল মুখ তুলে তাকালো ছোট ভায়ের দিকে। চোখ দুটো বোজা, শুকনো ঠোঁট সাদাটে দেখাচ্ছে মুখখানা বিবর্ণ, ফ্যাকাসে। মায়ের ডাকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো জামাল, তারপর দুজনেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ঘরের বাহিরে যে সরু বারান্দা, সেখানে দাঁড়িয়ে গুলনাজ ফিসফিস ক'রে বললো, "জামাল, শীগ্গীর আবদুলের দোকানে চলে যা ত, কিছু চাল, আটা আর আলু নিয়ে আয়। বলবি, দিনকয়েকের মধ্যেই শোধ করে দেব।'

মায়ের কথা মতো জামাল পথে বার হলো। কিন্তু তার ছেঁড়া কোট্ রাস্তার শীত আটকানোর পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। তার উপর পায়েও যেন কোন জোর পাচ্ছে না সে। তাই রাস্তার ধারের বাড়ীগুলোর দেওয়াল ধরে ধরে সে হেঁটে চললো মুদির দোকানের দিকে। কারাপাশা পাহাড়ে যাবার রাস্তার ওপরেই পড়ে দোকানটা। দোকানের এক ধারে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে দোকানদার, দোকানে পৌঁছে সেই আগুনের ছোঁয়াচে একটু যেন স্বস্তি পেল জামাল। আগুনের ধারে সমস্ত খদ্দের-এর পিছনে সে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো, যাতে দোকানীকে একটু নিভৃতে পাওয়া যায়, সেই সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ যাতে দোকানের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় কাটানো যায়। খদ্দেররা একে একে সকলে চলে গেলে সে আগুনের কাছ থেকে সরে এলো, তারপর দোকানীর মুখের দিকে তাকিয়ে শুষ্ক কণ্ঠে বললো, "একসের চাল, একসের আটা আর এক সের আলু দিন।" বলেই যেন টাকা বার করছে এইভাবে কোটের পকেটে হাত ঢোকালো। কিন্তু পরক্ষণেই এমন ভাব করলো যেন টাকাটা ভুলে বাড়ীতে ফেলে এসেছে। কণ্ঠে যথাসম্ভব জোর এনে বললো, "যাঃ! ভুল করে টাকাটা বাড়ীতে ফেলে এসেছি যে! এখন এই ঠাণ্ডার মধ্যে বাড়ী ফিরে ত আর নিয়ে আসা যায় না! তার চেয়ে আপনি বরং আমার মায়ের নামে খাতায় লিখে রাখুন, আমি কাল এসে দামটা দিয়ে যাবো।"

তার ধীর অথচ স্পষ্ট স্বরের প্রতিধ্বনি রাস্তার শেষ বাড়ীটা থেকেও শোনা যায়। যাদের জলের প্রয়োজন, তারা দর্শনের ডাক শোনামাত্রই বেরিয়ে আসে, বলে, "দর্শন, এদিকে 'একবার' জল দিও।" কেউ বলে 'দুবার,' কেউ বা 'তিনবার'। 'একবার' জলের অর্থ দু'ক্যানেস্তারা জল। দর্শন তখন কুয়োতলায় উঠে আসে, ক্যানেস্তারা দুটোয় জল ভর্তি করে, তারপর সেই জল বাড়ী বাড়ী পৌঁছে দেয়। এইভাবে একবার কুয়োতলা, একবার এ-বাড়ী একবার সে-বাড়ী এই ক'রে কোথা দিয়ে যে তার সারাদিন কেটে যায়, দর্শন তা টেরও পায় না। এর বিনিময়ে প্রতি ক্ষেপে সে মাত্র এক আনা ক'রে পায়। সত্যি কথা বলতে কী, কেবলমাত্র নিজের উপার্জনের ওপর নির্ভর করতে হলে দর্শনের পক্ষে তিন-তিনটি প্রাণীর মুখে অন্ন জোটান সম্ভব হতো না। ঈশ্বরের অসীম করুণা! দর্শনের স্ত্রী গুলনাজের সপ্তাহে তিন থেকে চারদিন বাড়ী বাড়ী গিয়ে কাপড় কাচার ডাক আসে। কিন্তু এ-কাজের সুযোগ সচরাচর আসে না, আয়ও হয় খুব সামান্য। তাই রোজগারের অন্য কোন রাস্তা না পেয়ে সে একটা দুঃসাহসিক কাজ বেছে নিয়েছে। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর বিকেলের দিকে দর্শন বাড়ী ফিরে যখন বিছানায় এসে শোয়, তখন সে ক্যানেস্তারা দুটো নিয়ে নিজেই কুয়োতলায় উঠে আসে, তারপর সে দুটোয় জল ভর্তি ক'রে দূরের বাড়ীতে বাড়ীতে পৌঁছে দেয়। দর্শনের ঘুম ভাঙবার আগেই আবার ঘরে ফিরে আসে। এর থেকে তাদের আর্থিক অনটনের কিছুটা লাঘব হয় বইকী!

কিন্তু এ'সব কিছুই হটাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। দর্শনের মৃত্যুর কারণ জানতে মোটেই দেরী হলো না। দেখা গেল ক্রমাগত জল পড়ে পড়ে কুয়োতলাটা শেওলায় একেবারে ভর্তি হয়ে রয়েছে। দর্শন যখন তার জল ভর্তি ক্যানেস্তারা দুটো কাঁধে ফেলে উঠে দাঁড়াতে গেছে, তখন পিচ্ছিল পাথরের ওপর তার শরীরের ভারসাম্য রাখতে পারেনি, হুমড়ি খেয়ে পড়েছে পাথরের উঁচু চাতালটার ওপর। তার রক্তাক্ত দেহের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, যেন একটা নিশ্চল ভারী পাথরপ'ড়ে আছে কুয়োতলার।

দর্শনের মৃত্যু-সংবাদ গুলনাজের কাছে পৌঁছতেই সে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো। সে যে তার স্বামীকে না জানিয়ে কুয়ো থেকে জল তুলে বিক্রি করতো ঈশ্বর তার জন্যই কী তাকে এই শাস্তি দিলেন? না, না, তা' কখনই হতে পারে না। যারা দেখেছে, তারা সকলেই বলছে, সে পা হড়কে পড়ে গেল এবং ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। যে কেউ এভাবে হড়কে পড়ে গিয়ে মারা যেতে পারে।

জ্ঞান ফিরে পাবার পর গুলনাজ ভাবতে লাগলো, এরপর সে কী করবে তার স্বামী তার জন্য রেখে গেছে কেবল দুটো টিনের ক্যানেস্তারা আর একটা লোহার শিকল আট্‌কানো লাঠি। ন'বছর আর ছ'বছরের দুটি বালককে ফেলে রেখে দূর দেশে পালিয়ে যেতেও সে পারে না। লোকের বাড়ী কাপড় কেচে কী ক'রে সে দুটি অবুঝ শিশুর খিদে মেটাবে? অবশ্য একটা উপায় তার আছে। কুয়ো থেকে জল তুলে সেই জল বাড়ী বাড়ী বিক্রি করলে এখন আর কেউ তাকে বাধা দেবে না। কিন্তু জলের কথা ভাবতে গিয়ে গুলনাজের সারা মন কেমন যেন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। না, কুয়োতলায় সে আর যাবে না, জলের কাছ পর্যন্ত ঘেঁসবে না কখনও।

মৃত্যুর কালো ছায়া যখন কোন বাড়ীতে নেমে আসে, তখন বাড়ীর লোকেরা যে বিষয়টা প্রথমেই ভুলে যায়, তা'হলো,—খাওয়ার কথা। দেড় দিন কি বড় জোর দু দিন এইরকম চলে, তারপর সকলেই যখন খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠে, তখন কেউ একজন বলে ওঠে, "এসো, আমরা কিছু খেয়ে নিই।" এইভাবে, খাওয়ার মধ্য দিয়েই আবার চলতে আরম্ভ করে দৈনন্দিন জীবনের রথচক্র।

কটা টাকা কী যোগার করা যায় না ? তার মনে পড়লো, কে যেন একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিল বড়বাজার-এর কথা সেখানে পুরোনো কাপড়-চোপড় অল্পদামে বেচা-কেনা চলে। কিন্তু এতক্ষনে তা নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে গেছে। ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই তার।

সমস্যার একটা তাৎক্ষণিক সমাধান করতে পেরে গুলনাজ মনে মনে একটু স্বস্তি পেল। ঘরের মধ্যে অহেতুক পায়চারি না করে এক সময় চুপি চুপি সে তার ছেলের বিছানার পাশে এসে বসলো। মনে হ'লো, ছেলেটার জ্বর ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে।

খিদের যাতনায় কামালও ঘুমুতে পারেনি। দুটি চোখ মেলে সে সবকিছু লক্ষ্য করছিল। একটু পরেই জামাল গোঙাতে শুরু করলো, হাতদুটো বারকয়েক শূন্যে ছুঁড়ে আস্তে আস্তে পাশ ফিরে শুলো। তার সারা মুখে তখন আগুন জ্বলছিল। কিছুক্ষণ পরে আবার সে চিৎ হয়ে শুলো। ছাদের কড়িকাঠের দিকে তার ঘোলাটে চোখ দুটো কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। ছোট ভাই কামাল খুব কাছ থেকে তার দাদাকে দেখছিল। তার দাদা প্রলাপ বকতে শুরু করতেই সে তার বিছানায় এসে বসল। তারপর খুব নীচু গলায়, যাতে তার মা'ই কেবল শুনতে পায়, সে বলে উঠল, "মা, দাদা কী এবার মরে যাবে ?"

গুলনাজের মনে হলো, একটা ঠাণ্ডা দমকা বাতাস এসে যেন তার সমস্ত শরীরটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে চলে গেল। ব্যাকুল দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল তার ছেলের দিকে, তারপর একসময় স্বপ্নোত্থিতের মতো বলে উঠল, "কেন, একথা বলছিস কেন ?"

মায়ের করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো কামাল। হাত দুটোকে চিবুকের কাছে জড়ো করে এনে ঝুঁকে বসলো, তারপর কণ্ঠস্বরকে দাদার কাছ থেকে প্রাণপণে লুকোবার চেষ্টা করতে করতে বললো, "দাদা মরে গেলেই ত জমিদার বাড়ী থেকে আবার খাবার আসবে!"

এক একটি ইজম এর গোঁড়া ভক্তেরা মনে করেন যে ঐ মতের প্রতিষ্ঠা হলেই পৃথিবীর সকল দুঃখ দূর হইবে। আজকাল তাই কোন কোন দেশে ইজমের লড়াই ঘনাইয়া উঠিয়াছে। আমার নিজের কিন্তু মনে হয় যে, কোন ইজমের বা মতবাদের দ্বারা মানব জাতীর উদ্ধার হইতে পারে না, যদি সর্বাগ্রে আমরা মনুষ্যোচিত চরিত্রবল লাভ করিতে না পারি।

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

পরের দিন হলো অদ্ভুত কাণ্ড। যে যার নিজের স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠলো। গুলনাজের মনে হলো, রাস্তার কোন ভদ্রলোকের নিশ্চয়ই কাপড় কাচার জন্য লোকের প্রয়োজন। বলা ত যায় না, একদিন সকালে হয়ত সে শুনলো লোকটি কাউকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে, "গুলনাজকে আজ আমার বাড়ীতে কাপড় চোপর কাচার জন্য আসতে ব'লো।" আজ এই সামান্য ডাকটির জন্যই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সে। কিন্তু তার জীবনের বর্তমান বিপর্যয়ের কথা ভেবে কেউই আর তাকে কাজের জন্য ডাকলো না।

সেদিন গুলনাজের ঘরে কেউই সহজে বিছানা ছেড়ে উঠতে চাইলো না। তাদের চোখের সামনে নানারকম খাবারের চিত্র ফুটে উঠছে। ছোট ছেলেটি হঠাৎ বলে উঠল, "দেখ, দেখ মা, আমি কত রুটি দেখতে পাচ্ছি। কি সুন্দর, নরম, তুলতুলে, দেখ দেখ……।" হাত বাড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করলো সে যেন তার হাতের নাগালের মধ্যেই পেয়ে গেছে।

এদিকে বড় ছেলে জামাল দেখতে লাগলো মিষ্টির স্বপ্ন। সে ভাবতে লাগলো, জমিদার-বাড়ী থেকে যখন নানা-রকম মিষ্টি এসেছিল, তখন নিজের ভাগেরটা একবারে না খেয়ে যদি সে বুদ্ধি ক'রে কিছুটা রেখে দিত, তাহলে এখন ত সেগুলো সে একটু একটু ক'রে খেতে পারতো!

গুলনাজ নিজের বিছানায় শুয়ে তার ছেলেদের বিড়বিড় শুনছিল, আর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল অশ্রুরোধ করতে, কিন্তু দু'এক ফোঁটা জল তার অজান্তেই ঝরে পড়লো। বাইরে জীবন যেমন চলছিল, ঠিক তেমনই চলতে লাগলো।

রাস্তার একেবারে শেষপ্রান্তে থাকে রুটি-বিক্রেতা হাসান। প্রতিদিন ভোরে ঘড়িতে যখন ঠিক ছটা বাজে, সে তার ছোট টাট্টু ঘোড়ায় চেপে রুটির ঝুড়ি নিয়ে এসে দাঁড়ায় বড় বড় বাড়ীগুলোর সামনে। রুটি বোঝাই ঝুড়ি দুটো ঘোড়ার পিঠে শক্ত করে বাঁধা থাকে। ঘোড়ার খুরের টক্ টক্ আওয়াজ অনেক দূর থেকেই শোনা যায়।

বড় ছেলে জামালই প্রথম শুনতে পেল সেই আওয়াজ। শুনেই তাকালো ছোট ভায়ের মুখের দিকে। জামালও তখন আওয়াজটা শুনতে পেয়েছে। সে আনন্দের আতিশয্যে গদগদ স্বরে বলে উঠলো, "রুটি! রুটি!"

আওয়াজটা ক্রমেই কাছে আসতে লাগলো। সেই ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো গুলনাজ। গায়ের চাদরটা ভালভাবে জড়িয়ে নিয়ে প্রস্তুত হলো বাইরে বেরোবার জন্য। সে ঠিক করেছে, হাসান এলেই তার কাছ থেকে সে দু'পাউণ্ড রুটি ধার চাইবে। কাপড় কেচে টাকা পেলেই সে শোধ করে দেবে রুটির দাম। ঘোড়ার খুরের ঐ আওয়াজ আজ তাকে যেন পাগল করে তুলেছে। বলতে গেলে একরকম বাধ্য হয়েই সে খুলে ফেললো বাইরে যাবার দরজাটা। খুলেই দেখতে পেল হাসানের সাদা ঘোড়াটাকে। চৌকো ঝুড়িদুটো এতই বড় মাপের যে, জন্তুটার সারা পিঠটাই তাতে ঢাকা পড়ে গেছে। দুটি ঝুড়িই রুটিতে ভর্তি। বাইরে থেকে বেশ বোঝা যায়, রুটিগুলো নরম, টাট্‌কা আর খাঁটি ময়দার তৈরী। সে চোখ বড়ো বড়ো করে সেইদিকে তাকিয়ে রইলো।

রুটিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ-ই এক সময় যেন সম্বিত ফিরে পেল গুলনাজ। হাসানের কাছে তাকে যে দু'পাউণ্ড রুটি ধার চাইতে হবে একথা সে একেবারে ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে হাসানকে বলবার জন্য সে তার ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক করেছে, ঠিক তখনই লোকটা তার ঘোড়ার উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে উঠলো, "হেই-হো, হেট্, হেট্।"

আলোচনা

এ ধরণের কৌশল আবদুলের মোটেই অজানা ছিল না। চশমার ফাঁক দিয়ে জামালের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে সে ঈষৎ বাগত স্বরেই বললে, "টাকাটা আগে বাড়ী থেকে নিয়েই এসো না বাপু, তারপর জিনিস নিয়ো।"

তার মিথ্যে অভিনয়টুকু প্রকাশ হয়ে পড়ছে দেখে জামাল তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'ঠিক আছে, আমি এখুনি নিয়ে আসছি।" বলেই হন্‌হন্ ক'রে বেরিয়ে গেল দোকান থেকে।

আবদুলের দোকানে সে নিজে ছাড়া তার স্ত্রীও থাকে—তাকে নানাকাজে সাহায্য করবার জন্য। জামাল চলে যেতেই আবদুল তার স্ত্রীর দিকে ঘুরলো, কাছে সরে এসে বললো, "জানো, এদের জন্য আমার দুঃখ হয়। জগতে এদের আর কী আছে, যা দিয়ে সারা জীবনটা সুখে-শান্তিতে কাটাতে পারে!"

তার স্ত্রীও সায় দিলো তার কথায়, বললো, "আমারও কষ্ট হয় এদের কথা ভেবে। আহা, বেচারা!"

এদিকে রাস্তায় নেমে জামালের মনে হলো, শীতটা যেন এখন আরও বেড়েছে। দোকানে ঢোকবার আগে শীতটা তবু সহ্য করা যাচ্ছিল, কিন্তু এখন ছুঁচের মতো এসে গায়ে বিঁধছে। জমিদার বাড়ীর উঁচু চিমনি থেকে কেবলই ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ঐ বাড়ীতে যারা থাকে, তাদের জীবন কত সুখের, কত আনন্দের! না, ওদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে জামালের এতটুকু ঈর্ষা হয় না, বরং ওদের সুখী জীবনের প্রতি তার অকুণ্ঠ সমর্থন আছে। কেননা, ওরাই তাকে একদিন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ খাবার খাইয়েছে!

সে যত দ্রুত সম্ভব বাড়ীর দিকে হেঁটে চললো, ঠাণ্ডায় তার দাঁতগুলো কন্‌কন্ করছে। হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে একসময়ে সে অতিকষ্টে ঘরে ঢুকলো। কিছুই বলতে হলো না তাকে, শূন্য হাত দুটোই তার হয়ে সবকিছু জানালো। মা এবং ছোট ভাইয়ের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে সে গা থেকে কোটটা খুলে ফেললো, তারপর দীর পায়ে বিছানায় গিয়ে শুলো। বিছানাটা এখনও কিছুটা গরম তবুও সে শীতে কাঁপতে লাগলো। চাদরটা কোন রকমে গায়ের ওপরে টেনে নিয়ে সে বললো, "উঃ! কি শীত!" তারপর একটু দম নিয়ে আবার বললো, "আমার ভীষণ শীত করছে মা।"

জামালের কম্পিত দেহের ওপর প্রথমে একটা কম্বল বিছিয়ে দিলো গুলনাজ। তারপর চোখের সামনে যা কিছু দেখতে পেল, তাই জড়ো করতে লাগল তার গায়ের ওপর। দুটি ভয়ার্ত চোখের দৃষ্টি মেলে সে দেখতে লাগলো তার ছেলের দেহের ওপর স্তূপীকৃত কাপড়গুলোর দিকে। কাঁপুনিটা এক ঘণ্টার ওপর রইলো। তারপর এলো জ্বর, রীতিমত ঘাম দিয়ে। গুলনাজ আস্তে আস্তে জামালের মুখ থেকে চাদর সরিয়ে দিলো, তারপর উত্তপ্ত কপালে তার ঠাণ্ডা হাত ছোঁয়ালো।

একটু পরেই উঠে দাঁড়ালো সে। অসহায়ের মতো ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো। সে জানে না, এখন কী করতে হবে। চিন্তা করবার সামান্য শক্তিটুকুও আজ সে হারিয়ে ফেলেছে। কোন এক আকস্মিক মুহূর্তে সে অনুভব করলো, ক্ষুধা-ব্যাপারটা তার শরীর থেকে একেবারে অন্তর্হিত হয়ে গেছে। অত্যধিক গরম কিংবা ঠাণ্ডায় দেহ অবশ হয়ে ক্রমশ অসাড় হয়ে আসছে।

একটু আগে সূর্য্য অস্ত গেছে। জোরো ছেলেটার বিছানা থেকে চাদরগুলো সরিয়ে ঘরের এককোণে জড়ো করে রেখেছে গুলনাজ। স্তূপীকৃত কাপড়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার মনে হলো, ঐগুলোর বিনিময়ে

AS I UNDERSTAND SHELLEY

BARUN GHOSH
B. A. (Hons) 2nd Year

I have been acquainted with P. B. Shelley, one of the romantic poets, through some of his poems ; and they have left a deep impression on my mind about Shelley.

Shelley is a brilliant lyricist. "His lyrical gift is indeed the purest in the whole range of English poetry—spontaneous music, ethereal beauty, unexcelled ideality." This gift is brilliantly shown in his lyric, 'To a sky lark'—a poem of rapturous melody.

In the golden lightning
Of the sunken sun,
O'er which clouds are brightning,
Thou dost float and run,
Like an unbodied joy whose race is just begun.

Shelley's poetry catches the glow of light which, in Wordsworth's words, "never was on sea or land." His imgination is always 'something afar.' He always longs for an unattainable thing that is beyond his reach. That is why he looks upon his skylark not as a mere bird but as a spirit who soars high up in the sky "like an unbodied joy whose race is just began." Shelley despises this earth 'where cares abond.' To him the heaven is a true kingdom of happiness, the earth is full of 'shadow of annoyance' In this respect he differs from Wordsworth who is 'true of the kindred points of heaven and home.'

He has a revolutionary sprit which is best shown in his 'Ode to the Westwind.'

Wild spirit, which art moving everywhere ;
Destroyer and Preserver ;

The same thought is also expressed by Rabindranath Tagore in his 'Barshashes.' Mohitlal Majumder expresses also this idea in his poem 'Kal-Baisakhi.'

Shelley's poem is often marked with a melancholy. He always suffers from the agony of his life. He wants to leave this world for ever. He is like poet Keats.

প্রবন্ধ

TALK THROUGH 'ETHER'

ASHIS KUMAR BANERJEE
B.Sc. 2nd Year (Hons)

I—Transmission and propagation

Sound waves travels only comparatively short distances and at approximately 344·6 m/sec. Therefore, the instantaneous transmission of Sound waves, as they are, over a long distance cannot be done by direct transmission. It requires the transmission of electrical variations of the same frequency and corresponding amplitude. For the complete communication system, a microphone for converting sound waves into electrical waves at the transmitting station and a loudspeaker for converting the electrical waves back into sound waves at the receiving station are necessary.

The radio wave from a radio transmitting station has a constant frequency and amplitude. This radio wave by it self will not produce any sound at the loudspeaker of the ordinary receiving. Such a radio frequency is called the carrier wave. Different radio transmitting stations have carrieis of different frequencies on which they transmit their programmes. If a carrier wave is to carry a programme, some feature of the wave must be varied in accordance with the electrical variations of the programme to be transmitted. One way to do this, is to vary the amplitude of the radiated wave in accordance with the sound to be transmitted. The programme may be transmitted by other means also. One may maintain the amplitude constant and vary the frequency of the carrier wave. In India, only amplitude modulation is used for broadcast transmission. The path chosen by the radio wave to travel from the transmitting to the receiving autenna depends primarily on the carrier frequency of the station. The most important of these are the ground waves, the sky waves, and the space waves.

Ground waves :— Radio waves with frequencies between 300 and 3,000 Kilocycles (K c) are called ground waves. These waves follow the curvature of the Earth. Reception of these waves is possible only with a small area around the transmitting station. But the reception is very good and is not affected by weather or atmospheric conditions. Broadcast programmes on the medium wave band, 550 to 1,650 kc, are thus via ground waves.

Sky waves :— Around-the-world communication is possible by these waves. Sky waves have frequencies between 3 and 30 megacycles (1Mc-1,000Kc) which are covered by the short wave bands.

[illegible]

receiver, while the other is a wave that reaches the receiver after reflection from the Earth's surface. The latter component loses its significance as the frequency is still increased and reception is possible through a direct or line-of-sight path. The area within which the reception is possible is called the "radio horizon." The width of the radio horizon is slightly larger than optical horizon and depends on the relative heights of the transmitting and receiving antennas. This is the reason why the television broadcast antennas are placed at a height. When the amplitude of a carrier wave is modulated, its frequency also changes, giving side bands whose frequencies are equal to the frequency of the carrier wave plus and minus the frequency of the programme signals. Thus to limit the side bands, the full spectrum of the sound frequency, which ranges from 20-20,000 cycles, is not transmitted.

For general commercial amplitude-modulated broadcast tranmission, the maximum frequency of the audio signal is about 5,000 cycles. The side-bands of an amplitude-modulated carrier wave will therefore upto 5 kc above and below its carrier frequency. For example, a broadcasting station operating on a carrier frequency of 1,000 kc will have side band frequencies ranging from 995 kc to 1,005 kc. Each transmitting stations thus requires a 10 kc band for commercial amplitude-modulated broadcast. This band is called the radio channel. In order to prevent interference between two station operating on adjacent channels, there should be a difference of at least 10 kc in their carrier frequencies when a capacitor is connected across a coil it forms a resonating circuit. The frequency of resonence depends on the values of the capacitor and the inductor used. To receive the desired modulated carrier, the resonent frequency of the circuit must be changed to correspond to the frequency of the desired station. This is generally done by varying the capacitor. The process of selecting the signals from a particular station is called tuning. The variable capacitor used for tuning the desired station generally has a rotation of 180° degrees. With such a capacitor, the amount of change in frequency for each degree of rotation will vary on each band of the receiver. On broadcast band, 550 kc to 1,620 kc each degree would represent a change of 1100 divided by 180 or aproximately 6 kc. As there should be at least 10 kc difference between two stations, there is no problem in tuning a desired station. On the short wave bands, tuning a desired station is difficult as the frequency of the band is increased.

11—Practical circuit of 3-band all-wave receiver : (AC)

Those of you who are electronically-minded may be able to construct it ; others may find it difficult. But actually, as you will see, they are very simple.

Now more than ever seems it rich to die
To cease upon the midnight with no Pain.

Shelley depicts natural phenomena with a vivid touch. But they are endowed with spirituality. As he says :

I love snow, and all the forms
Of the radiant frost :
I love waves, and winds, and storms,
Everything almost
Which is nature's, and may be
Untained by man's misery.

Shelley always personifies natural objects. To him they seem to be friends. A. Clutton Brock has rightly pointed out that the sun and the moon, stars and sky are quite friends to Shelley. This gift of Shelley is called myth-making power.

Shelley is endowed with the above characteristics which makes him one of the best poets of romantic age. His keen observation, spirituality of everything, desire for something afar, lighten his skilfulness as a poet.

Education is the manifestation of perfection that is already in man.

VIVEKANANDA

A THRILLING SPORT

SUBHAS KANTHA ROY
S. U. O.

In the field of mountaineering I gathered much experience through many valuable trainings which provided me confidence of safety in Rock-Climbing. Although I do not find any difficulty in climbing operations. I know I have many things yet to learn about this subject.

In this article I am describing my past experiences about Rock-Climbing courses which I have undergone with the different organisation of India as a trainee and also as an Instructor. This rock climbing holding some techniquics and interests in itself. It is an organised sport and is comparatively younger in India than in the western countries. In the past Everest conquest period the rock climbing has received special boost. Thanks to attention paid by the Central Government and few state Governments, Tenzing's great achievement has been an eye-opener. Day by day, better and better facilities for conducting the courses in rock climbing are made available and more and more people are being attracted towards this enchanting and thrilling sport.

In the Western countries this sport is taken as a weekend invitatian from one friend to another it is like this :

"My dear Thomas,

As it has been announced a three days holiday, I invite you for Rock Climbing practice in the same place where we went before. I hope you will surely bring another new face before us as you have done previously.

With best wishes."

Yours loving,
HENRY.

In our country, as we find, this sport is becoming popular to some of us. This sport is simple and scientific. It is more a sport of brain than of brawn, that is why it is all the more worthy of an experience, one could wish for it. It is full of thrilling experiences and not at all risky as people may imagine. The misconceived notions about the risk involved in rock climbing can be compared to the similar notions held by non swimmers about swimming. One may not believe this, because unfortunately rock climbing is not as familiar to us as swiming is, but it is the simple home truth.

Radio mirror :— The upper part of the Earth's atmosphere absorbs large quantities of radiant energy from the sun which not only heats the atmosphere but produce some ionisation in the from of free electrons and positive and negetive ions. The part of the upper atmosphere where ionisation is oppreciable is called the ionosphere. The ionosphere has layers and three of these layers have the maximum ionic density. There are at heights about 100, 200 and 300 Km above the Earth's surface. They act as a radio mirror and reflect the sky waves back to the Earth. Frequencies above 30 Mc penetrate these layers and get lost in space.

The distance on the Earth between the transmitting autenna and the place where the skywaves are first received after reflection from the ionosphere is called the skip distance. In this region, there is zone of silence where no signals are received at all by the receiving autenna. This area is called the skip zone. This is the reason why sometimes you may be comparatively close to the short wave transmiting station but yet not receive any programme from the station.

Depending on the strength of the signal transmitted by the station, the wave once reflected from the ionosphere, after returning to the Earth, may bounce back to the ionosphere and get reflected again. Thus the wave may get repeatedly reflected, and following a series of hopes, may travel round the world several times.

Therefore you may receive a series of echoes, each separated by one seventh of a second, depending on how many turns the wave takes around the world.

The height, the ionic density and the numbers of layers in the ionosphere change from time to time depending upon various conditions. This causes considerable changes in skip distances and signal strength. This is why some times your radio set may receive short wave transmission very clearly but some other time it may fall into the skip zone and not receive the signals.

The variation in strength of the signal for a short period is called fading. Fading may also occur because of the interference of the sky waves arriving by different hops or by reflection from different layers of the ionosphere. Up to a certain extent, the automatic volume control (A. V. C.) circuit of the receiver corrects fading. To avoid fading for a long duration, short-wave stations transmit the same programme simultaneously on defferent carrier frequencies, as the behavior of the ionosphere varies with different frequencies. These carrier frequencies are chosen such that if you are in the skip zone of one carrier frequency you may receive the programme on another frequency.

Space waves :— Space waves are radio transmissions at frequencies above 30 Mc used for television, frequency modulation, rader etc. Space waves commonly consists of atleast two components. One is a wave that travels directly from the transmitter to the

॥ যুগ যন্ত্রণার বিদ্রোহী কবি নজরুল ॥

ধীরেন্দ্র নাথ দাস
কলা, দ্বিতীয় বর্ষ (সান্ধ্যানিক)

যুগের তীব্র যন্ত্রণাই সৃষ্টি করে নব নব মানুষের। উনিশ শতকের যন্ত্রণার অন্যতম কবি হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। কবি ইসলামকে সেদিন বিদ্রোহী কবি ভিন্ন অন্য পদে আখ্যা দেওয়া যেত কি না বাঙালীর পক্ষে সে শব্দ চয়ন করা নিশ্চয়ই কঠিন ব্যাপার ছিল। আর তাঁর জীবন সুরেই মিশে ছিল বিদ্রোহের ভাব। জন্ম থেকেই দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁর প্রাণে এসেছিল বিদ্রোহের প্রবল বন্যা। তাঁর কাব্যের বিচারেই আমরা পেয়েছি তাঁর জীবন-দর্শনের সূক্ষ্ম পরিচয়।

নজরুল ইসলামকে জানতে হলে তিনি যে যুগে বা সময়ে তাঁর কাব্য রূপ সঞ্চয়ন করেছেন সেই সময়টাকে বোঝা আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

বেঙ্গলী ভবল কোম্পানীতে যোগদান করবার যে ডাক নজরুল ইসলামের কানে এলো তা ছিল তাঁর কাছে দেশ-প্রেমের উদাত্ত বাণী। এ না হলে মেট্রিকুলেশন ক্লাসের প্রথম ছাত্র তিনি এবং সকলে মনে করেছিলেন পরীক্ষা দিয়ে তিনি জলপানি পাবেন। কি জন্য তিনি সব কিছু ত্যাগ করে ফৌজে চলে গেলেন তা প্রথমে কেউ বুঝতে পারে নি। সেই ফৌজের সকল যুবকই ফিরে এল মনে উদাস ভাব নিয়ে; আর নজরুল এলেন দেশ-প্রেমের বন্যা বহন করে। তিনি শুধু একজন অসাধারণ কবি নন এছাড়াও তার আরো একটি পরিচয় হলো স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক হিসাবে। সুতরাং তাঁর কবিতায় আমরা তাঁকে একজন কবি হিসাবেই পাই না! তিনি যে একজন স্বাধীনতাকামী বীর সৈনিক ও দেশ-প্রেমিক একথা আমরা কখনও ভুলতে পারি না।

১৯১৯ সালে সাম্রাজ্যবাদী বর্বর শোষণকারী বৃটিশ সরকারের শাসন সংস্কার জনগণ মেনে নিতে চায় না। দেশের মধ্যে খুব বিপ্লব বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে এবং ঠিক ঐ সময় রুশ দেশের সর্বহারা শ্রমিক গোষ্ঠীর বিপ্লবের ক্ষুব্ধ তরঙ্গ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে কিছু পরিমান আমাদের দেশে এসে পড়েছে। তখন কবি তাঁর সান্ধ্য পত্রিকা বের করলেন মুজফফর আহমদ ও ফজলুল হক সাহেবের সহায়তায়। এই প্রাত্যহিক পত্রিকার নাম করণ করা হল "নবযুগ।" যখন বের হবে হবে করছে তখন অনেকে ধারণা করেছিলেন যে কবি ইসলাম ভালো ভাবে বাংলা ভাষা লিখতে পারবে না। ফজলুল হক সাহেব প্রস্তাব করেছিলেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে সম্পাদকের কাজ পরিচালনা করতে। কিন্তু কবি ইসলাম এতে রাজী হলেন না! কারণ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় নীতি হীণ ধনিক শ্রেণীর ভাড়াটে লেখক, তার কোন নীতিই নেই, যখন যে তাকে মালকড়ি দেয় তখন তার হয়ে কয়েক কলম লিখেন। তাই নির্দিষ্ট দিনে কবি ইসলাম ও মুজফফর আহমদের চেষ্টায় কাগজ বের হল। নজরুল ইসলামের বড় বড় লেখা গুলো ছোট আকারে সুন্দর রূপে তার পত্রিকায় প্রকাশ হতে লাগলো। ১৯২০ সালে ভারতবর্ষে একটি আন্দোলন হয়েছিল যার নাম ছিল হিজরত আন্দোলন।

List of components you will need :

Valves :- ECH42, EF41, EBC41, EL41, EZ40
or ECH81, EE89, EBC81, EL84, EZ80

Condencers I Mica or ceramic :
100 PF-4, 50 PF-1, Paper :— ·05-2, ·01-1, ·005-2

Electrolytic : $\frac{32+32\text{MFD}}{35\text{ Volts}} + \frac{25\text{MFD}}{25\text{ Volts}}$

Cantype-1,

Padder :— 600PF-1, Trimmess :— 4-70 PF-6
I. F. Transformer 1 set, Mains Transformer-1 p.c.
Choke-1, Output Transformer-1, Band switch-1,

Resistances :—

10Meg	½ Watt—	1pc
1 „	„	2pcs
·5 „	„	1 „
·2 „	„	1 „
47K	„	2 „
33K	1 Watt	1 „
22K	„	1 „
300R	„	1 „

V/Control— ·5meg-1, speaker 6"-1, Noval valve Bases-5 pes, Coil set-1 p.c.
Misc :— Knob, Cabinet, Wire, Nuts and bolts, Chases etc.

SUBHAS KANTHA ROY
(The writer of "A Thrilling Sport")

ভগবানের আঁখিজল। ......এই অন্যায় শাসনক্লিষ্ট বন্দী সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল বলেই কি আমি রাজদ্রোহী? এ ক্রন্দন কি একা আমার? না এ আমার কণ্ঠে ওই উৎপীড়িত নিখিল নীরব ক্রন্দসীর সম্মিলিত সরল প্রকাশ? আমি জানি আমার কণ্ঠের ওই হুঙ্কার একা আমার নয়, সে যে নিখিল আর্তপীড়িত আত্মার যন্ত্রনা চীৎকার। আমায় ভয় দেখিয়ে আমার এ ক্রন্দন থামানো যাবেনা। হঠাৎ কখন আমার কণ্ঠের এই হারাবাণী তাদের আর একজনের কণ্ঠে গর্জন করে উঠবে। .....আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করিনি, সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য তরবারী তীব্র আক্রমন সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। ......আমি সত্য রক্ষার ন্যায় উদ্ধারের বিশ্বপ্রলয় বাহিনীর লাল সৈনিক।'

এছাড়াও আমরা দেখি তাঁর কাব্যে তিনি আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন, বিভিন্ন দেশের মুক্তির আন্দোলন, শ্রমিক ও স্বাধীনতাকামী মানুষদের স্বপক্ষে উদাত্ত আহ্বান জানাতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু তখনও তিনি তার মুল লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেননি। তাই তাঁর কতগুলি কবিতা আমরা ছন্নছাড়া ভাবে দেখতে পাই। মনে হয় বিদ্রোহ থেকে বিপ্লবে যাত্রার মাঝপথে কোথায় যেন তিনি আটকা পড়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন, এই সকল পরিস্থিতি দেখে—

বন্ধু গো, আর বলিতে পারিনা, বড় বিষ জ্বালা এইবুকে,
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারিনাতো একা,
তাই লিখে যাই এ রক্তলেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসে নাক মাথায়, বন্ধু বড় দুখে!
অমর কাব্যে তোমার লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে!
পরোয়া করিনা, বাঁচি-না-বাঁচি যুগের হুজুক কেটে গেলে,
মাথার ওপর জ্বলিছেন রবি রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা ক'র যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।"

আমাদের স্বাবার এও মনে হয় নজরুলের কাব্য যেন গুলিবিদ্ধ বাঘ। সামনে শিকারীকে না পেয়ে অসহ রাগে নিজের গা কামড়াচ্ছে। এই বিক্রম, যন্ত্রনা, ক্ষোভ, আক্রোশ, দংশন ও গর্জনই নজরুলের কাব্যের মহিমা।

"নবযুগ" পত্রিকার সম্পাদনার সময় তিনি নানা রাজনৈতিক কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। এই কবিতাগুলি সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লেখা। তৃতীয় দশকে তাঁর এই কবিতাগুলি প্রকাশ হতে লাগল।

নজরুলের রাজনৈতিক কাব্যের কথায় এবার আসা যাক। ১৯২১ সালের ১৩ই অক্টোবর 'ধুমকেতু' "... সর্বপ্রথম ভারতের স্বাধীনতা চায়।" সেই বক্তব্য সমস্ত বিপদের ঝুঁকির কথা ব্যক্ত করেছিলেন। আর সেই বৎসরই ১৯২২ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর বের হল কবির "আনন্দময়ীর আগমনে" শীর্ষক কবিতা। ইংরেজ সরকারের তখন আর নাকে তেল দিয়ে চুপ করে থাকা সম্ভব হলোনা বলেই তিনি গ্রেপ্তার হলেন। সন্তানের এই কষ্টে নয়নাশ্রু ঝরে পড়লো মায়ের পায়ে:

This sport can be devided into two parts. Namely Climbing and Repelling. Both are interesting in their own ways but latter is more thrilling. In the begining most of us were not very enthusiastic about rock climbing course as we too had many apprehensions about it. In actual climbing there is no risk of failling down because every climber is belayed from the top of the rock. In actual practice the Instructor climbs up first and demonsrtates the method of climbing without having any belay. After reaching the top he would belay the first trainee climber then the next and so on. Yet most of us were not certain that it was not risky. But with firm determination one after another we began to climb up. While climbing, we mostly get only small pinches here and there which would not allow any hand grip excepting with finger trips and we had to move whole body up with the support of these finger tip holds in a systematic way. As we moved inch by inch and reached the top of the first rock, we felt greatly relieved but at the same time filled with joy. Half of the earlier fears were dispelled and we looked forward to climb the higher rock. When we reached the top of a higher rock a sense of achievement ran through us. As we looked around from the summit, the sight of the wide lanscape around extending to many miles, filled our hearts with inexplicable happiness. After a few climbs as we gained in confidence, some of us even did not feel ths necessity of belaying This in itself was a tremendous achievement. Repelling is nothing but the reverse action to climbing in particular style with the help of rope and touching the rock with feet making angle with it. The most prominent thing in repelling is that while coming down the rock no other part of the body, except feet touch the rock at an angle and move rythimically, while the hand under gloves take the support of rope only. The hand hold is vital as the repeller's life depends upon it. When the instrucfor first gave us the demonstration everyone of us felt it incredible.

We were rather bewildered to see the instructor standing at top of the high rocks with the whole body leaning back wards making an angle with the rock. Moreover while coming down he used the movement of his feet. In another demonstration he came down walking along the rock keeping his body horizontally parallel to the ground. We watched all this in utter amazement and at the end when he came down safely we could not believe our eyes, it was so in comprehensible. When our turn came many of us seemed to back away, But the bolder trainees came forward and repeated the feat shown by the Instructor with a sense of great achievement. When I repelled down, it was a great thrill to me. Above all I immidiateiy realised that it was absolutely without any danger. When once we did it, we liked to do it again and again. Ultimately it just became nothing more than a child's play. The whole coures was an episode full of thrills, excitements and rare moments of happiness. It was an experience never to be forgotten.

In conclusion I may asure al my interested brothers and sisters that this thrilling and exciting sport of Rock-Climbing is really worth while and there is nothing more joyous and courageous game than this if once confidence is achievad after proper training.

রবীন্দ্র ভাবনায় বাংলাদেশ

মানস কুমার জানা
বিজ্ঞান (জীব) দ্বিতীয় বর্ষ

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজনবিদিত বিশ্বকবি। এ কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নাই। আজ এ কথা ভুললে চলবে না যে, তাঁরই ইন্‌স্পিরেশনে বাংলাদেশের জন্ম। তিনি রক্ত মাংসে, অস্থি-মজ্জায়, ধমনী-শিরায় বাংলার স্নেহ-মমতায় জড়িত ছিলেন। অর্থাৎ বাংলাদেশের নব-জন্মের সূচনায় তিনিই ছিলেন আগামী দিনের সূর্য্য। তিনিই ছিলেন সব্যসাচী, রাজপ্রমাতা-রাজগ্রহীতা, রূপদ্রষ্টা-রূপস্রষ্টা, বাঙ্গালী জন-মানসে কি ভাবে জড়িত ছিলেন, কয়েকটা উক্তিতে প্রমান হয়ে যায়—

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুন্য হউক পুন্য হউক হে ভগবান।
—কিংবা
বাংলার ঘরে যত ভাই বোন এক হউক হে ভগবান।'

'জল পড়ে পাতা নড়ে,' সে কবির সাড়া মিথ্যা হয়নি। ভগবানের কাছে তাঁর প্রার্থনা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়নি, তাঁরই সাড়ায় সাড়া দিয়ে বাংলাদেশে আজ নূতন দিনের সূচনা। এই প্রসঙ্গে কবির একটা উক্তি উদ্ধৃতির অপেক্ষা রাখে 'যে মৃত্তিকার আমাকে বানিয়ে তুলেছেন, তাঁর হাতের প্রথম কাজ বাংলাদেশের মাটি দিয়ে তৈরী,'— 'ছোট বেলা', চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

বিশ্ব- সমাজে আমরা অর্থাৎ বাঙ্গালী যেন অনাদৃত, অপাঙক্তেয়, তাই তিনি ক্ষোভে ও দুঃখে বলেছিলেন—

'সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী
রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করনি।'

তাঁর সেই অনুশোচনা বাঙালী মানসে কাঁচকাটা হীরের মত দাগ টেনেছে, তাই আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি বাঙালীর অস্তসত্তা অনাদৃত, অপাঙক্তেয় নয়। সত্যিই কবি যদি এই ভাবে কলমের আঁচড় না টানতেন, তবে কি আমরা সহজে জাগতাম? এ প্রশ্নের উত্তর বিরাট।

তাঁরই সাড়ায় বিশ্ব আজ মুক্তির নেশায় এগিয়ে চলেছে, এ মুক্তি হল আধ্যাত্মিক সত্যের অর্থাৎ স্পিরিচুয়াল ট্রুথের মুক্তি। একটি কথা এখানে মনে পড়ে—

'মুক্তি, ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, আপনি প্রভু পরের বাঁধা সবার কাছে।' সে মুক্তির সূচনা এখন নয় অনেক আগে থেকেই চলে আসছে। আসা যাক আইরিশ মুক্তি সংগ্রামীদের কথায়,

এই আন্দোলনের ফলে ১৮ হাজারেরও বেশী মুসলমান ভারতবর্ষ ছেড়ে আফগানিস্তান যায়। তীব্র অত্যাচার ও শোষণের হাত থেকে বাঁচার জন্যই লোকে এই হিজরত বরণ করতো। তখন কবি ইসলাম "নবযুগে' যে শিরোনামা দিয়ে এই বিষয়টা প্রকাশ করেছিলেন সেই লেখাটা হলো এইরূপ "মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?" আমরা কি ভুলতে পারি সেই হাবিবুল্লার হত্যা বীভৎসতা। সেদিনটার কথা খুব মনে পড়ে যেদিন খবর এসেছিল যে সামরিক পুলিশের সঙ্গে একদল মুহাজিরিন গোলমাল করায় কাঁড়াগাড়ী নামক স্থানে মুহাজিরিনদের উপর গুলিবর্ষণ হয় ও একদল ভারতীয় সৈনা তিন তিন বার গুলিবর্ষণ করে, এতে শুধু একজন নিহত ও একজন আহত হয়। কোন "মূর্খ বিশ্বাস করবে একথা?"

আর এদিকে ঐ বৃটিশ শাসকদের অত্যাচার ভীতি ক্রমেই বীভৎস মূর্তি ধারণ করেছে, যেমন জালিওয়ানবাগের হত্যাকাণ্ড। আপোষকামী বুর্জোয়া নেতৃত্বের প্রতি আস্থাহীন অথচ গণক্ষোভে রাগে অভিমানে সন্ত্রাসবাদীর পথ গ্রহণের জন্য আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। শুধু অস্বস্তিকর বোধ করে নি অস্থির হয়ে উঠেছে সারা ভারতবর্ষ। বিক্ষোভ, মিছিল, মিটিং, দানা বেঁধে উঠেছিল দিকে দিকে। শ্রমিকগোষ্ঠী ক্রুদ্ধ, কৃষক শ্রেণী অধৈর্য, দেশ অগ্নিগর্ভ, বিক্ষোভ বিহ্বলতা ও আক্রোশ, অসমতা, ক্রোধ, হতাশার জটিল ও জলন্ত চিহ্ন বহন করে। এই সময় আমাদের বাংলার ভাগ্যাকাশে নজরুল তাঁর সাহিত্য নিয়ে, তাঁর কবিত্ব নিয়ে আবির্ভাব হলেন। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আবর্তন মুহূর্তে মুহূর্তে রূপ পেতে লাগল তাঁর সাহিত্যে এবং কাব্যের মাধ্যমে। সাহিত্য ও রাজনীতির স্টেজে এসে দাঁড়ালেন এই যুগের কবি যিনি আত্মবিশ্বাস নিয়ে হুজুগের কবি বলে ঘোষণা করলেন নিজেকে। সেই জন্য তিনি লিখেছিলেন—

"বর্ত্তমানের কবি আমি ভাই
ভবিষ্যতের নই নবি
কবি অকবি যা বলো মোরে,
মুখ বুজে তাই সই সবি॥"

যুগ কেটে গেল। তিনি বাঁচুন আর নাই বাঁচুন এর জন্য তাঁর কোন কষ্ট কিংবা দুঃখ নেই। ঘৃণা, বিদ্বেষ, তিক্ততায় অস্বস্তি হয়ে উঠেছিল তাঁর কাব্যের উপজীব্য। তিনি শুধু কোন এক শ্রেণীর কবি নয়, তিনি ছিলেন কৃষকের কবি, শ্রমিকের কবি, তরুণদের কবি, নারীর ও সংগ্রামী মেহনতী মানুষের কবি এবং শৃঙ্খলিত জাতির কবি। তাই একদিন কবি কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল—

"অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানেনা সন্তরণ
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃ মুক্তি পণ।
"হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী বলো, ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।"

তাই শ্রেণী-তিক্ততা, জ্বালা ও অন্তর্দাহ নিয়ে টগবগ করে ফুটেছিল তাঁর কাব্যে। ঈশ্বরকে তিনি স্বৈরাচারী জালেম শাসকের প্রতীক ও প্রতিফলিত রূপ বলে একাধিক কাব্যে প্রকাশ করেছিলেন। এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীকাব্যের স্তরে পরিণত করেছিলেন তাঁর কাব্যকে। সাম্প্রদায়িকতা, জাতি ভেদ, নারীবিদ্বেষ, ঘৃণা ইত্যাদির মত সামন্তবাদের ঘৃনিত বহিঃপ্রকাশের বিরুদ্ধে তাঁর কাব্যের মাধ্যমে নির্মম অভিযান শুরু করেছিলেন। শ্রেণী সংগ্রামের রণাঙ্গনে পীড়িত মানুষের আত্মবিশ্বাস ঘোষণা করেছিলেন তার জ্বালাময়ী বাণী—"উৎপীড়িত আত্মবিশ্বাসীর পক্ষে আমি সত্যকবি,

বাঙালী কী কোনদিন ভেবেছিল, স্বাধীন হৃদয়চেতনায় বিশ্বদরবারে তার সংস্কৃতি, আদর্শ, সত্য, সাধনা, তার ভাব ব্যঞ্জনা উত্থাপন করতে পারবে? কিন্তু কবির বলাকা কাব্যের ৪৪ সংখ্যক কবিতাটি আমাদের সুপ্ত মানসমন্দিরকে সাড়া দিয়েছে। আদর্শের অমৃত সন্ধানে যাত্রা পথে অজস্র দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়। তাতে হতোদ্যম হয়ে পিছিয়ে পড়লে চলবে না,—

'ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার।
চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার—
সে তো নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
.....
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।'

বাঙালী জীবন সাগরে আধ্যাত্মিক তত্ত্বদর্শনে ঐতিহ্যময় বিশ্বমানব অনাদ্যন্ত জীবন ধারায় নূতন রংয়ের আবির্ভাব হচ্ছে, এই উপলব্ধি করতে পারলে অবলুপ্তির চিন্তাধারা আমাদের কোনদিন ক্লিষ্ট করতে পারবে না। কারণ জীবনে ক্ষয় ক্ষতি আছে বলেই জীবন অমৃত লাভ করে। ফেলে আসা দিন গুলির পিছন চেয়ে অনুশোচনা করলে চলবে না। আবদ্ধ বস্তুকে চলমান জীবনশক্তি দান করে এগিয়ে যেতে হবে। কবির কথায় বলতে গেলে 'যাওয়া এবং আসাকে একবার বিচ্ছিন্ন করে জানতে হবে, নইলে এই দুটিকে মিলিয়ে জানতে পারব না।' —পূর্ববৎ।

যুগান্তকারী মানববোধের আদর্শ নিয়ে এগিয়ে যেতে কবি আহ্বান জানিয়েছেন,

সে পথে প্রান্তরে
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব
বিরাট স্বরূপ
যুগযুগান্তের।
'এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর।'

বাঙালীর মনকে কেউ কোনদিন বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি, পারবেও না, এমনকি যারা গর্ব করে বলত 'যাদের দেশে সূর্য্য অস্ত যায় না, তাদের দ্বারা বিচ্ছিন্নতা আজ মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছে।

কবি-হৃদয়ের ভালবাসা গানেই প্রকাশ পেয়েছে।

—'আমার, সোনার বাংলা আমি
তোমায় ভালবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।'

"আর কতকাল থাকিব বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল ?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।"

এইভাবে একের পর এক কবির 'সাম্যবাদী' 'কৃষকের গান' 'সব্যসাচী' প্রভৃতি কবিতাগুলি প্রকাশিত হতে লাগল 'লাঙল' পত্রিকাও ঐ সময় দেশের রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে স্বচ্ছপথে চালাতে শুরু করলো। নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গে ভঙ্গী পঞ্চাশ বছরের পরে রবীন্দ্রনাথ তার "বলাকায়" প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই কাব্যে প্রধান ছিল বেগ ও গতি, কিন্তু কাজী নজরুলের কাব্যে শুধু বেগ ও গতিই ছিল না, তার সঙ্গে ছিল প্রচণ্ড সংক্ষোভ ও দুর্দমনীয় আত্মপ্রকাশ যাকে সাহিত্যের ভাষায় বলে স্বাধিকার প্রমত্ত। বিদ্রোহী কাব্যে তিনি নানা সুরের সাথে কত সুন্দর সুষ্ঠুভাবে তাল রেখেছেন, নানা ভাষার কি রকম মিল রেখেছেন তার কাব্যে ও কবিতায়। তিনি বাংলাদেশে বিদ্রোহী কবিরূপে এই জন্য বিখ্যাত। 'অগ্নিবীণা'য় তিনি ধ্বনিত করেছেন আগুনের সুর, 'বিষের বাঁশীতে' সুর লহরীর বিষাক্ত বাষ্পে তিনি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার অত্যাচারকে চেয়েছিলেন ধ্বংস করতে। আপোষহীন সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি অসংখ্য কবিতার মাধ্যমে। আরো দুটি কবিতার কথা না বললেই নয়। এই কবিতা দুটো হলো 'কামালপাশা' ও 'ঝড়'। কাব্যে ছন্দের সাথে এবং ভাবের সাথে অপরূপ মিল রেখে তিনি একজন শুধু প্রথম শ্রেণীর কবি রূপেই নয়, একেবারে অনন্য সাধারণ কবিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। "বলাকাকে" যেমন কোন রবীন্দ্র অনুসারীরা অনুসরণ করতে পারেননি, কিন্তু নজরুলের এই শ্রেণীর কবিতাও অনুসৃতিই রয়ে গিয়েছে। বাংলা দেশের তখন ঘরে ঘরে তাঁর কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে প্রচার হচ্ছিল। [যেমন ১৯০৫ সালে রাশিয়াতে বিপ্লবের আগে গোর্কির "ঝড়ের পাখী" কবিতাটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।] রাশিয়ার মায়া কোভসির সাথে নজরুলের একদিক দিয়ে খুব মিল আছে। নানান ভাব ভাষা এবং নানান ছন্দের সংমিশ্রনে আবৃত্তি ও যৌথ সঙ্গীতের উপযোগী একটি কাঠামো তাঁরা দুজনেই তৈরী করেছিলেন।

ভীতির কবলে ও দুর্যোগে পতিত মানবের নব উদ্ভবের এক নিষ্ঠা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কবির সূক্ষ্ম ভাব ও মাধুর্যকে আশা করাটা নিরাশা মাত্র। সাধারণ মানুষকে বাঁচার প্রেরণা দিতে গিয়ে আগ্নেয় গিরির উত্তপ্ত লাভাস্রোতের ভাষা নিয়ে সূক্ষ্ম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি কখনো বা কারাগারের লৌহ কপাট ভেঙ্গে ফেলবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। সমাজে যারা অবহেলিত, অপমানিত, দলিত, লাঞ্ছিত তাদেরই হয়ে তিনি এই জয়গান গেয়েছেন—

জয় নিপীড়িত প্রাণ !
জয় নব অভিযান !
জয় নব উত্থান !'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হল। সাম্রাজ্যবাদীরা চারিদিকে মার খেতে লাগল। অনেক রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করতে লাগল এবং পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে এক আমূল পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল। "ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয় গান" সেই সমস্ত শহীদদের রক্তাঞ্জলীতে আমাদের দেশেও ফিরে এল স্বাধীনতা। কিন্তু আমাদের দুঃখের বিষয় আজ যে কবিকে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, সুজলাং শস্যশ্যামলাং বঙ্গ মাতার সেই সু-সন্তান মৌন ও নির্বাক।

"আজ সখি বুঝিলাম আমি
সুন্দর আমাতে আছে আঁখি
তোমাতে যে হল ভালবাসা।"

শুধু উপমার ক্ষেত্রেই নয় বাস্তব ক্ষেত্রেও রোমান্টিক কবি নিছক কল্পনা থেকে ফুলের সৌন্দর্য্য আলোকিত করে অতি সামান্য একটা অপরিচিত লতাকেও কাব্যে স্থান দিলেন। কবি এর নাম দিলেন "নীলমনিলতা।" যা কেবল প্রকৃতি প্রেমিক কবির পক্ষেই সম্ভব—

"তুমি সুদূরের দূতী নূতন এসেছ নীলমনি
স্বচ্ছ নীলাম্বর-সম নির্মল তোমার কণ্ঠধ্বনি।
যেন ইতিহাস জালে বাঁধা নহ দেশে কালে
যেন তুমি দৈববাণী বিচিত্র বিশ্বের মাঝখানে
পরিচয় হীন তব আবির্ভাব কেন একে জানে।"

প্রকৃতির কবি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় ফুলের কথাই বার বার ব্যক্ত করেছেন। সৌন্দর্য্যের পূজারী কবি যেন ফুলের সৌন্দর্য্যে ভরা ধরিত্রীকে দর্শন করলেন। 'পুনশ্চ' কাব্যে কবির 'পুকুর ধারে' পুকুরের বর্ণনায় এর নিদর্শন স্বরূপ—

"এধারের ডাঙ্গায় করবি সাদা রঙিন একটি শিউলি,
দুটি অযত্নের গন্ধরাজ ফুল ধরেছে গরীবের মতো
বাখারি বাঁধা মেহেদির বেড়া।"

আবার 'কাক' কবিতার বর্ণনায়—

"এদিকে বাগানে পথের ধারে
টগর গন্ধরাজের পুঁজি ফুরোয় না,
এরা, ঘাটে জটলা করে বউদের মতো
পরস্পর হাসাহাসিতে ঠেলাঠেলিতে
মাতিয়ে তুলেছে কুঞ্জ আমার।"

কোন ফুলই কবির নিকট বাদ পড়েনি, 'বামা' কবিতায় নদীর বর্ণনায় দেখতে পাই কবি অতি সামান্য ফুলের সাহায্যেও বর্ণনার অঙ্গহীন করেন নাই উদ্ধৃত স্বরূপ—

"জাকল পলাশ মাদারে চলেছে রেশারেশি
সজনে ফুলের ঝুরি দুলছে হাওয়ায়
চামেলি লতিয়ে গেছে বেড়ার গায়ে গায়ে,
মধুরাক্ষী নদীর ধারে।"

"Somehow, some where and by some body a beiginning must be done."

কিংবা ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল দিনটি আশাকরি মনে আছে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সম্যক আশাবাদী। জীবনকে তিনি সংগ্রামের হাতিয়ার করে চলার পথে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। এমন কি বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে একাই চলতে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। তাঁরই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মানবিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, বাঙালীর মুখে উচ্চারিত হল,

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে।'

সে বীজ আজ নয় ১৯৩০ সালে ২২শে এপ্রিল জালালাবাদের পাহাড়ে পাহাড়ে মাষ্টার দা সূর্য্য সেন, লোকনাথ বল, সাহসে শৌর্যে বীর্যে একা চলার শপথ নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। আজ ও চলছে তার প্রমাণ। আশাকরি ভিয়েতনামের কথাটা মনে আছে। আদর্শবাদের হৃদয় চেতনায় ভিয়েতনাম বৃহৎ শক্তির শোষন শাসন কোন দিন শির পেতে গ্রহণ করেনি, করবেও না। কারণ রবীন্দ্রনাথের মানবতার আদর্শবাদকে তারা গ্রহণ করে শিখেছে 'অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।'

জীবনকে তুচ্ছ ভেবে 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান,' এই ভেবে জনগনমন অধিনায়ক শেখ মুজিব, হো-চি-মিন হাজারে হাজারে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে স্বকীয় আদর্শকে অক্ষুন্ন রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দিয়েছেন দীক্ষা।

'.....সংসারে ক্ষয় আছে, মৃত্যু আছে, যদি না থাকত তবে অক্ষয়কে অমৃতকে কোন অবকাশ দিয়ে দেখতে পেতুম। তাহলে আমরা কেবল বস্তুর পর বস্তু বিষয়ের পর বিষয়কেই একান্ত করে দেখতুম, সত্যকে দেখতুম না।' —শান্তিনিকেতন ১৪। এবং আরও বলেছেন কঠিন সমস্যার সমাধান সংকল্পে স্বার্থসিদ্ধি ও সুখবিলাসের মধ্যে ডুবে থাকলে জীবনের লক্ষ্য বস্তু পাওয়া যাবে না। মহান অর্থাৎ সচেতন হৃদয় সাধনা দুঃখের সাধনায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। কবি 'পূর্ববৎতে সুস্পষ্ট উক্তি দিয়েছেন। শেখ মুজিব উদ্দীপ্ত প্রাণসত্তার আলোড়ন তুলেছিলেন। তাই তিনি ডাক দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন 'দিতে হয়, দেব আরো এক নদী রক্ত।' স্বার্থসিদ্ধি ও সুখবিলাসের দিকে না গিয়ে বরণ করে নিলেন মৃত্যু। কবির কথায় বিশ্বাস করলেন 'সংসারে মার আছে মৃত্যু আছে।'

নব জীবনের নববর্ষ নিয়ে মেতে থাকলে চলবে না, সে চলার পথে অনেক রয়েছে বাকী। কবি বলেছেন "মানুষের নববর্ষ আরামের নববর্ষ নয় এ এখন শান্তির নববর্ষ নয়, পাখীর গান আর গান নয়, অরুণের আলো আর আলো নয়, তার নববর্ষ সংগ্রাম করে আপন অধিকার লাভ করে আবরণের পর আবরণকে ছিন্নবিদীর্ণ করে তবে তার অভ্যুদয়।" কবি আধ্যাত্মিক সত্যে নবজীবনের অভয় বাণী দিয়েছেন.

"মানুষ আনন্দহীন নিশিদিন ধরি
আপনারে ভাগ করে শতখানা করি।"—চৈতালী।

কারণ জন্ম মৃত্যু হল জীবনের সবকিছু। যাহা বিরহ, মৃত্যু অর্থাৎ ভূমা ও বোধের, আরো গভীরে গেলে বোধের অর্থাৎ ব্রহ্মের, ব্রহ্মের, এক কথায় বলা চলে, 'একমেবদ্বিতীয়ম্।' জীবন ধারনের পবিত্র গৌরব ও সুন্দর প্রকাশ তখনই পায় যখন স্বার্থের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত হয়ে বৃহৎ কল্যাণের ক্ষেত্রে মানুষকে অগ্রসর হতে হয়। যাহা বিগত যুদ্ধে বাংলাদেশ প্রমাণ দিয়েছে।

বাধ্য হই যে বিশ্বকবির কাব্যকে সৌন্দর্য্যের রূপদান করেছে ফুল। ফুলের সৌন্দর্য্যেই কবির কাব্য এতখানি সৌন্দর্য্য মণ্ডিত, এত অলঙ্কৃত। রবীন্দ্র কাব্যে ও সাহিত্যে সত্যই ফুলের অবদান অতুলনীয়।

বর্ত্তমাণ বাস্তব জগতের অনেক কবি কাব্যের বেড়াজালে আবদ্ধ। তাঁহার কাব্য সম্ভারের পটভূমিকায় স্থান দিয়েছেন নিছক বাস্তব জগতের ইট, কাঠ পাথর চুন প্রভৃতির কাব্য ফুলের সৌন্দর্য্যকে তাঁহারা স্বীকার করেননি। তাই আমরা দেখতে পাই বর্ত্তমান কবি-গণের কাব্যে অনেক, কিন্তু তাতে ফুল একটাও নেই। ফলে কাব্যগুলো সৌন্দর্য্য হতে বঞ্চিত। সেইজন্য বর্ত্তমান কাব্যের ধারা যে অবনতির পথে সেকথা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়। আধুনিক কবিদল ইট, কাঠ, পাথর চুন প্রভৃতির সাহায্যে গৃহনির্মাণে প্রবৃত্ত হতে চলেছে, কিন্তু গৃহ-পার্শ্বস্থিত ফুলের সৌন্দর্য্য থেকে গৃহকে অনেকখানি দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। সেই জন্য বর্ত্তমান কবিদের কাব্য এত শ্রীহীন।

বিশ্ব কবির কাব্য চির-শাশ্বত, শাশ্বত কবির কাব্য চিরকালের মানুষের জন্য। যখন পৃথিবীতে গড়ে উঠবে ভবিষ্যৎ মানবের রাজ্য, যখন শাশ্বত কালের মানুষ উদগ্রীব হয়ে উঠবে বিশ্বকবিকে জানবার ইচ্ছায় তখন কবির কাব্যেও ফুটে উঠবে শত সহস্র শতদল।

সব বাধা ত বিরোধী শক্তির সৃষ্টি নয়—সাধারণ অশুদ্ধ প্রকৃতিরই সৃষ্টি, যা সকলের মধ্যেই আছে।

শ্রীঅরবিন্দ

"রবীন্দ্র কাব্যে ফুল"

মাধব চন্দ্র সিংহ সহেস রায়
কলা, দ্বিতীয় বর্ষ, সাম্মানিক

ফুল যে সকলের নিকট প্রিয় এ কথার আর দ্বিরুক্তি করতে হয় না। উৎসব অনুষ্ঠান হতে শুরু করে বিবাহ প্রভৃতি পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রেই যে ফুলের প্রয়োজনীয়তা তা নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে হয়, অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও শত শত যুবক যুবতীর সৌন্দর্য্যকে ছাপিয়ে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় সভাপতির টেবিলের ফুলদানির উপর। উৎসবের ক্ষেত্রেও ঠিক অনুরূপ ব্যাপার। উৎসবের প্রচণ্ড ধুমধামের মধ্যেও প্রকৃত প্রাণের সাড়া জাগায় উৎসব প্রাঙ্গণে "একরাশি ফুল।" তাই আমরা কবি সত্যেন্দ্র নাথের কথায় বলতে পারি—

"জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিও ক্ষুধা লাগি
দুটি যদি জোটে এক পয়সার
ফুল কিনে নিও হে অনুরাগী।"

মানুষের সাধারণ জীবন যাত্রার ক্ষেত্রেও ফুলের বৈশিষ্ট্য যে কতখানি তাও আমরা অনুধাবন করতে পারি মনুষ্য জীবনের পাতায় পাতায়। বিবাহের অফুরন্ত আনন্দ কোলাহল ও চাক চিক্যনের মধ্যে যুবক যুবতীর পবিত্র মিলনের প্রকৃত স্বরূপ একখানি ফুলের মালার পরিবর্ত্তনে। বিবাহের পর যুবক-যুবতীর অবিমিশ্র আনন্দের ফুলশয্যাতেও ফুলের প্রয়োজনীয়তা। তাই এত আনন্দ। কাজেই একথা বলা যায় যে যেখানে আনন্দ এবং সৌন্দর্য্য সেখানেই ফুল এবং যেখানেই ফুল সেখানেই আনন্দ এবং সৌন্দর্য্য। ফুলের এই বৈশিষ্ট্য কেবল সাধারণের কাছেই নয়, কবির অন্তর্দৃষ্টিতেও ফুলের সৌন্দর্য্য অনেক খানি। ফুল যেমন ফোটে, কবির কাব্যও সেই রকম ফুটে ওঠে ফুলের উপমায়। ফুল ফোটার প্রকৃত পরিচয় সুগন্ধে ও সৌন্দর্য্যে। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ফুলের আসন অতি উচ্চে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ফুলের স্থান কতখানি তাই নিয়ে এখন আমরা প্রবন্ধ শুরু করলাম।

অনেক লেখক রবীন্দ্রনাথের বিশ্বখ্যাতিতে অনেক আলোচনা উপস্থাপিত করেছেন। আমরা এই ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় তার অধিক প্রকাশের ক্ষমতা হয়ত নাই। তথাপি আমার মনে হয় যে ফুলেই রবীন্দ্র কাব্যকে এতখানি সৌন্দর্য্য দান করেছে। কাব্যে ফুলের উচ্চ আসনই বিশ্বকবির কাব্যকে এতখানি সৌন্দর্যের আলোকে আলোকিত করেছে। আমার ধারণা যে বিশ্বকবি যদি কাব্যে ফুলের স্থান না দিতেন তাহলে হয়ত রবীন্দ্রনাথের কাব্য এত সৌন্দর্য্য মণ্ডিত হোত না। ফুলের বর্ণনাতেই রবীন্দ্র কাব্য এত শোভিত।

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্—সত্য, শিব ও সুন্দরের উপাসক বিশ্ববরেন্দ্র কবি রবীন্দ্রনাথ যেন ফুলের মাধ্যমে কাব্যের রূপ ডালে অঙ্কিত করেছেন। ফুলের মাধ্যমে বিশ্ব কবির কবির প্রকাশ পায় সুন্দরী নারীর সৌন্দর্য্যে। নারীর সৌন্দর্যে যে রূপ, প্রেম ও ভালবাসার, বাস্তব জগতের সৌন্দর্য্য সেইরূপ ফুলে। কবির কথায়—

কথায় রূপার সঙ্গে চীন ঘুরলাম

অনুলেখক—পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক,
আশুতোষ কলেজ ছাত্রসংসদ

তিনতলার ছোট্ট ফ্লাটের দরজায় কলিং বেলটা টিপতেই সাচ্চুদা, হাঁ আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র বিখ্যাত ক্রিকেটার রবীন মুখার্জী দরজা খুললেন। আমাকে বসার ঘরে বসিয়ে গোমড়া মুখে পায়চারি করতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করতে জানতে পারলাম, জামাডোবায় ক্রিকেট পীচের মাটি পাঠানর জন্যই এই ব্যস্ততা। আগে থেকেই কথা ছিল, তাই সময় মতো শ্রীমতী রূপা মুখার্জী আমাদের ঘরে ঢুকলেন। মিষ্টি হেসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কি জানতে চান বলুন? আমি উৎসাহে বললাম "দেখুন চীন সম্পর্কে আপনাকে কাগজে অনেক কিছুই বলতে দেখেছি, কিন্তু যুবসমাজের ভূমিকা চীনে কেমন তা জানতে পারিনি?" রূপা হেসে বললেন "আজকে না হয় শুনেই নিন।" আমি আর থাকতে না পেরে কলম খাতা নিয়ে বসে গেলাম। এক এক করে প্রশ্ন করতে লাগলাম।

প্রশ্ন : আচ্ছা, চীনে নেমে আপনি কি রকম অভ্যর্থনা পেয়েছেন?

উত্তর : অন্য দেশের মতোই সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছি, ভারতীয় বলে আলাদা কিছুই হয়নি।

প্রশ্ন : চীনে যেয়ে চীনাদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

উত্তর : দেখুন উত্তরটা বড় সহজ নয়। তবে যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয় তাদের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। নিজেদের সম্বন্ধে কিছু বলতে তারা নারাজ।

প্রশ্ন : আচ্ছা, আমরা মনে হয় আমাদের দেশে যেমন বাক-স্বাধীনতা আছে ওদের দেশে তা নেই?

উত্তর : জোরের সঙ্গে বলতে পারি বাক-স্বাধীনতা তো ওদেশে দূরের কথা, মুখই কেউ খুলতে পারে না। যদি কেউ মুখ খোলে তবে জেনেই নেয় তার শাস্তি অবধারিত।

আমার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। আমাদের দেশে বাক-স্বাধীনতা নিয়ে এত গণ্ডগোল আর কমিউনিষ্ট চীনে কিনা.....

প্রশ্ন : আচ্ছা, আপনি তো চীনের যুবক-যুবতীদের দেখেছেন, তাদের দেখে আপনার কি মনে হয়েছে?

উত্তর : দেখুন, চীনে যুবক বলুন আর যুবতীই বলুন এক কথায় ওখানে ওদের জীবন যাত্রা সম্পূর্ণ একঘেয়ে। সত্যি কথা বলতে কি There's no life for youths. সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে যখন দেখি একটি যুবক একই রাস্তায় একটি যুবতীকে হাঁটতে দেখলে সেই রাস্তায় সে হাঁটেনা!

প্রশ্ন : এর থেকে কি মনে হয় না চীনে এখনও সংস্কার রয়েছে?

উত্তর : আমার তো মনে হয় আছেই। তাহলে শুনুন এক মজার কথা। আমাদের যিনি ইনটারপ্রিটার ছিলেন, তিনি এক বৃদ্ধ মহিলা। ভারতীয় দলের অধিনায়ক ফারুক খোদাইজি ভারতে স্মৃতি চিহ্ন নিয়ে যাবার জন্য তাঁর সঙ্গে মহিলাকে এক ফটো তুলবার অনুরোধ করলেন। বৃদ্ধা কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন, মেয়েদের একসঙ্গে ফটো তোলার রেওয়াজ নেই।

বিশ্বকবি সৌন্দর্যের বর্ণনায় অধিক প্রয়াসি ফুলের। তাই কবি কাব্যে বর্ণনার সকল ক্ষেত্রেই ফুলের প্রয়োজনীয়তা মনে করেন। বাস্তব ক্ষেত্রে অর্থগত বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করেও কবি কাব্যের সৌন্দর্য্য বর্ণনায় ফুলের কথা ভোলেন নাই। ফুল যেরূপ সুন্দর কবির বর্ণনা ও সেইরূপ ফুলের মত সুন্দর। যথা—

"কেশ এলাইয়া ফুল কুড়াইয়া
রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া
রবির কিরনে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরাণ ঢালি"

আবার—

"সেই গানে সেই ফুল্ল ফুলে
সেই প্রাতে প্রথম যৌবনে
ভেবেছিনু এ হৃদয় অনন্ত অমৃতময়
প্রেম চিরদিন রয় এ চির যৌবনে।"

প্রেমিক কবি 'মহুয়া' কাব্যে—'সাগরিকার' মাধ্যমে ফুলের উপমায় প্রেমের প্রকৃত মর্ম উদ্ধার করলেন। প্রেমের অব্যক্ত গুঞ্জনের কাহিনীকে কবি রূপ দিলেন কাব্যে। প্রেমিক কবির কাব্যে—

"কহিনু আমি, রেখোনা ভয় মনে,
পূজার ফুল তুলিতে চাহি তোমার ফুলবনে।
চলিলে সাথে হাসিলে অনুকূল,
তুলিনু যূথী তুলিনু জাতী তুলিনু চাঁপা ফুল।"

প্রকৃতি প্রেমিক কবি তন্ময়তার মাঝে সৌন্দর্যের উপলব্ধি করেছেন। নীরবতা ও দূরত্বের মাঝেই সৌন্দর্যের প্রকৃত প্রকাশ। যেরূপ আকাশ ও পৃথিবীর দূরত্বে আকাশের সৌন্দর্য্য এবং স্নেহ ও প্রেমের দূরত্বে ভালবাসার সৌন্দর্য্য, তেমনি ভাবে বিশ্বকবি ফুলের উপমায় নীরবতার মাঝে সৌন্দর্যের প্রকাশকে লক্ষ্য করলেন। বিশ্ব কবির কথায়—

"ফুলগুলি যেন কথা
পাতাগুলি যেন চারিদিকে তার
পুঞ্জিত নীরবতা।"

শুধু মাত্র হাস্যোজ্জ্বাসের প্রেরণাতেই নয়, অতি সাধারণ জীবন যাত্রার কারুণ্যের গভীরতা ও বিশ্ব কবির কাব্যে ফুলের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে, ফুল যেমন করে ফুটে উঠে ঠিক তেমনি করে সাধারণ মানুষের জীবনের মর্মন্তুদ করুণাও ফুটে উঠেছে কাব্যের দরদী কবির লেখনীর আঁচড়ে। তাই ফুলের সৌন্দর্যে মোহিত, কবির খোকাবাবুর কথা বার বার স্মৃতি পথে উদিত হয়। সৌন্দর্যের পিয়াসী খোকাবাবুর ফুলের জন্য অপমৃত্যু কবির কাব্যে একটা সকরুণ চিত্রের আলেখ্য। বিশ্বমানব রবীন্দ্রনাথের "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন" ফুলের জন্য খোকাবাবুর জীবন ট্রেজেডি চির মর্মন্তুদ। কিন্তু কবির কাব্য-সম্ভার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য মণ্ডিত। তাই অধিক উদাহরনের আতিশয্য ত্যাগ করে এক কথায় আমরা স্বীকার করতে

উত্তর : শৃঙ্খলাবোধ। ওদের কাছে সারা পৃথিবীর এই জিনিষটা শেখার আছে।

অনেক দূর ঘড়ির কাঁটা গড়িয়ে যাবার জন্য অনেক প্রশ্ন থাকলেও জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। প্রশ্ন শেষ করার আগে শ্রীমতী রূপা মুখার্জীকে আর কয়েকটা বিশেষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

প্রশ্ন : চীনে কি একনায়কতন্ত্র চলেছে?

উত্তর : আলবাৎ। চীনে যে কেউ ঢুকে বুঝতে পারবেন যে তিনি মাওসেতুং-এর দেশে চলে এসেছেন। জীবনের সব পাতায় মাওসেতুং আর মাওসেতুং। মাওসেতুং এর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বল্লেই মৃত্যুদণ্ড। ভাবতে পারেন, আমাদের দেশে, আমাদের দেশের নেতৃস্থানীয়দের বিদ্রূপ করা যায়, ব্যঙ্গ করা যায়, ও চীনে মাওসেতুং বা চু-এন-লাই বলে কেউ সম্বোধন করতেই পারবে না। বলতে হবে চেয়ারম্যান মাওসেতুং বা প্রিমিয়র চু-এন-লাই, তা না বল্লে, শাস্তি ভাগ্যে আছেই। এক কথায় আমি বলতে পারি, আমাদের দেশে ভগবানের মতো চীনে মাওসেতুং এর পুজো হয়।

প্রশ্ন : মাও এর পর চীনে কোন নেতার কি এই Image থাকবে?

উত্তর : Absolutly not. মাওসেতুং এর পর ওদেশে কোন নেতাই তো নেই। আমার ব্যক্তিগত ধারণা উনি মারা গেলে চীনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেবে।

আমি আমার শেষ করলাম আপনাকে যদি আবার কিছু দিনের জন্য চীনে যেতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে আপনি কি তা আবার গ্রহন করবেন?

উত্তর : কখনই না। সত্যি কথা বলতে কি, ভাল লাগল সব জিনিষ জানতে, দেখতে। সবার কাছে শুনতাম চীনের কথা। আর আজ চীন ঘুরে সে ধারণা যেন রাখতে পারছি না। ভাবতেই পারিনা আমরা কত বেশী স্বাধীন, কত বেশী সুযোগের অধিকারী। একটা কথা বলবো? ভাগ্যিস! ভারতে জন্মেছিলাম।

কলম বন্ধ করতে করতে বার বার মনে মনে ভাবছিলাম এই কি কমিউনিষ্ট দেশের নমুনা? তাহলে কি সব কমিউনিষ্ট দেশ গুলোতেই, কমিউনিজমের নামে.....

(শ্রীমতী রূপা মুখোপাধ্যায় বাংলার মেয়ে। তিনি চীনে বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এই সাক্ষাৎকারটি আমাদের কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে হয়েছিলো। ছাত্রদের জ্ঞাতার্থে এই সাক্ষাৎকারটি ছাপানো হ'ল।

পত্রিকা সম্পাদক, আশুতোষ কলেজ পত্রিকা।)

কয়েকটি লেখা

উগ্রপন্থী আন্দোলন—শিক্ষানবীশের চোখে

নির্বেদ রায়
কলা, দ্বিতীয় বর্ষ

পরিবর্তনশীল ইতিহাসের স্বচ্ছন্দ গতির নিয়মরক্ষা করবার জন্যই পৃথিবীর সর্বস্তরে কাল ও অবস্থার পটভূমিতে রিবর্তন ঘটা অবশ্যম্ভাবী। শুধুমাত্র প্রকৃতির ক্ষেত্রেই নয়, সৃষ্টির ক্ষেত্রেও, শুধুমাত্র জড়জগতে নয়, জীবজগতেও এমনকি ীবনযাত্রার পদ্ধতিতে বিবর্তনের ধারা বেয়ে পরিবর্তন ঘটে চলেছে। তাই বর্তমান জগতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ামাজিক কাঠামোর যে ঘন ঘন রূপান্তর ঘটছে, এটা অবশ্যম্ভাবী। এ ইতিহাসের সত্য। তাই এই ইতিহাসের পটভূমিতে বচার করলেই দেখা যাবে যে, এই অবস্থাগুলির কোনটাই চিরস্থায়ী নয়, একান্তই ক্ষণস্থায়ী, কালধর্মী বা যুগধর্মী।

সাম্প্রতিক কালে পশ্চিম বাংলার বুকে যুববিদ্রোহ একটা বিশেষ আকার নিয়েছিল। এটা অস্বীকার করার প্রয়োজন বা কারণ দেখিনা। তবে একটা জিনিষ বার বার লক্ষ্য করেছি যে, অনেকেই এই উগ্রপন্থী আন্দোলনকে স্বীকার করতে চেয়েছেন, কেউ কেউ বা 'তরুন প্রাণের উচ্ছাস' কিম্বা 'যুগের হাওয়া—অভিজ্ঞতার অভাব' ইত্যাদি ক্ষিপ্ত অযৌক্তিক বাক্যাংশে একে অভিহিত করেছেন। মোট কথায় খুব কম লোকই এই আন্দোলনটার মুখোমুখি াড়িয়ে এটাকে স্বীকার করে নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখতে চেয়েছেন। তার কারণ স্পষ্ট। যে যার গা বাঁচাতে ব্যস্ত। কিন্তু রাষ্ট্রের যারা কর্ণধার তাদের তো বটেই, এমন কি পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি মানুষের এই যুব-আন্দোলন সম্পর্কে জানার প্রয়োজন আছে। তবে সচেতন হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এই আন্দোলনের কাণ্ডারী যারা সেই যুবক-যুবতীদের সমাজে অপাংক্তেয় করে রাখা, তারা আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে সমালোচনার বিষয় হবার অধিকার রাখে। তাই প্রথমে আমাদের জানতে হবে, কেন এই যুব বিদ্রোহ কি তার কারণ—কি তার লক্ষ্য—কি এর পরিণতি?

বাইবেল ধর্মগ্রন্থে আদিম মানব-মানবীর উপাখ্যানে আছে যে, ঈশ্বরের অবাধ্যতায় জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষন করে াদম্ (Adam) ও ইভ্ (Eve) এর স্বর্গ থেকে নির্বাসন ঘটে। এটা চিরকালের মানুষের স্বভাব। গোপনীয়তা, াধানিষেধের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরকালীন। প্রকৃতির একান্ত নিয়মেই মানুষের রহস্যপ্রিয়মন বিপদের অজানা াহ্বানে সাড়া দেয়। পরিণতি বা ফলের কথা এখানে আসে না। যুক্তি দিয়ে এর বিচার করাও অসম্ভব। সেদিক দিয়ে বিচার করলে হয়ত দেখা যাবে যে, প্রতিবারই তার ফল ঘটেছে ঐ স্বর্গথেকে নির্বাসন, কিন্তু তবু 'নেড়া কবার বেলতলায় যায়,' এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া এ ক্ষেত্রে কঠিন। 'কালপুরুষের ছায়া যে দেখেছে, তাকে যেমন আর ঘরে াখা যায় না'—তেমনই যুবক মনকে রোমান্সের টান থেকে ফেরানো প্রায় অসম্ভব। এ যৌবনের ধর্ম। সংযমের বাঁধনে কে বাঁধতে প্রয়োজন অভিজ্ঞতার।

আর একটা জিনিষ কিন্তু ভুললে চলবে না যে, এই যুববিদ্রোহের প্রতিটি যুবক-যুবতীই দেশপ্রেমিক মুখে তাদের নেতারা যতই বলুন আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই তরুণ তরুণীদের লক্ষ্য ছিল বর্তমানের ভারতকে তাদের স্বপ্নের সোনার ভারতে রূপান্তরিত করতে। কিন্তু একটি মাত্র ভ্রান্ত পথের পথিক হয়ে, তাদের সমগ্র

প্রশ্ন : চীনের যুবক-যুবতীরা কি নিজেদের জানবার সুযোগ পায় ?

উত্তর : জানবার সুযোগ তো দূরের কথা, কথা বলারই সুযোগ নেই।

প্রশ্ন : আমাদের দেশে যুবসমাজের কাছে অবসর বিনোদনের সুযোগ আছে। ওদের দেশে তেমন কিছু কি আছে ?

উত্তর : অবসর বিনোদনের কথা চীনারা ভাবতেই পারেন না। চীনে পার্ক নেই এমন কি কোন ক্লাব পর্যন্ত নেই। সারা চীনে সিনেমাহল নেই। দু'একটি স্বদেশী নৃত্যের জন্য হল আছে।

প্রশ্ন : আমাদের যুবকরা যেমন স্বাধীনচেতা, ওদের দেশের যুবকরাও কি তাই ?

উত্তর : স্বাধীনচেতা তো দূরের কথা। আমাদের দেশের স্বাধীনতার একভাগ সুযোগও তারা পায় না।

আবার বলছি, Absolutly ওদের দেশের যুবসমাজের কোন Life নেই। জানেন, সব চেয়ে আশ্চর্য লাগে ওদের আমি হাসতে দেখিনি। They never Lough.

প্রশ্ন : আমাদের দেশে কোন এক মাওবাদী নেতা যুব-সমাজকে আহ্বান করেছিলেন, নাচ, গান, খেলা-ধুলা ছেড়ে বিপ্লবে নামতে। ওদের দেশে এমন কোন আহ্বান করা হয়েছিলো বা হয়েছে কি ?

উত্তর : মোটেই না, আমাদের দেশে খেলাধুলার যে সুযোগ দেওয়া হয় তার থেকে অনেক বেশী সুযোগ দেওয়া হয় খোদ চীনে। একটা মেয়েকে টেবিল টেনিস ব্যাট হাতে সারাদিন চর্চা করতে আমি দেখেছি, এমন কি রাস্তার বাচ্চাদের কাগজে মুড়িয়ে বল তৈয়ারী করে খেলতে দেখেছি। খেলা-ধুলার চর্চা না থাকলে টেবিল টেনিসে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয় কি করে ?

প্রশ্ন : দেখুন, আমাদের দেশে তো প্রকাশ্যে মাওসেতুং থেকে আরম্ভ করে অনেক শ্রদ্ধাভাজন বিদেশী নেতাদের লেখা থেকে শুরু করে ছবি এমন কি বাণী পর্যন্ত লেখা হয়। ওদের দেশে কি এমন কিছু দেখেছেন ?

উত্তর : আগেই বললাম তো, চীন ছাড়া ওরা কিছুই জানেনা। রাস্তায় লেনিন আর কার্লমার্কস ছাড়া কারো মূর্তি নেই (অবশ্য চীনা নেতারা ছাড়া তাও আবার মাওসেতুং) ওরা কথা বলে চীনা ভাষায়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে চীনের জিনিষ কাজে লাগায়। জানেন ইংরাজী ভাষা জানা সত্বেও চীনা প্রধানমন্ত্রী কথা বলেছেন চীনা ভাষায় ?

প্রশ্ন : এদেখে কি মনে হয়না ওরা আমাদের থেকেও স্বদেশপ্রেমী, জাতীয়তাবাদী ?

উত্তর : সে তো একশো বার। ওরা আমাদের দেশের থেকেও প্রচণ্ড জাতীয়তাবাদী।

প্রশ্ন : তাহলে কি বলতে চান ওরা অন্যদেশ সম্পর্কে নিরুৎসাহী ?

উত্তর : দেখুন, এটা ঠিক বলতে পারছিনা। তবে একটা জিনিষ দেখে অবাক হয়েছিলাম যে ওদের প্রতিদিন ৫০ পৃষ্ঠার একটা বুলেটিন বের হতো। আমরা যেতেই ঐ বুলেটিনটা ২৫ পৃষ্ঠার হয়ে গিয়েছিল। আর তাতে থাকতো কি জানেন ? শুদ্ধু খেলার খবর !

প্রশ্ন : আচ্ছা, আমাদের দেশে যেমন সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ করার সুযোগ আছে, ওদের দেশে সে রকম কিছু কি..... ... .

উত্তর : আগেই তো বলেছি, ওরা কথাই বলতে পারে না, তার আবার বিক্ষোভ, প্রতিবাদ! একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি যে, ওরা যা পায় তাতেই যে ওরা সন্তুষ্ট তা বলতে পারি না। কিন্তু ভয়ে কোন কথাই বলতে পারে না। জানেন শিশুরা শুধু বাঁধা কলির রস খেয়েই বড় হয়। এদেশে কেউ কি তা ভাবতে পারেন ?

প্রশ্ন : চীনে কোন বিষয় আপনাকে বেশী মুগ্ধ করেছে ?

বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য

নির্বোধের দৃষ্টিতে

দীপক দত্ত
বিজ্ঞান, দ্বিতীয় বর্ষ

মানুষের পৃথিবীতে মানুষই আজ নিরাশ্রয়। শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও এমনই এক ঘটনার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত কোন এক রাজনৈতিক দলের একটি নেতার পৃথিবীতে কোন দেশ যাকে স্থায়ী বসবাসের কোন সুযোগ দিতে পারেনি-আইনে বেধেছে। মানব সমাজের সীমান্ত মাড়িয়ে ঠিকানাহীন কক্ষচ্যুত নেতাটি তাই ক্রমাগত ঘুরে চলেছিল পৃথিবীর প্রান্ত থেকে প্রান্তান্তে। যেন গ্রহান্তরের দৃষ্টি নিয়ে নুতন করে সে আজ দেখতে চেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজকে আইনের শৃঙ্খলকে—যে আইন তাকে মানব সমাজের প্রবেশের কোন অধিকার দেয়নি। এই অদ্ভুত একা যাযাবর নেতাটির কাছে চোখে শুধু একটু বাসা একটু স্থায়ী বসবাসের জন্য মানুষের দরবার প্রতিনিয়ত কাতর আবেদন—কিন্তু হায়, বিপুলা এ পৃথিবীতে তার জন্য ঠাঁই নেই। তাই হারিয়ে যাওয়া বাংলার যুবকদের মাতার অভিশাপ নিয়ে তাকেও চলে যেতে হল।

তাই তিনি ঘটা করে শেষবারের মত কারাবরণ করে বাংলার যুব ও ছাত্রসমাজকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি একটুও বুঝতে পারলেন না যে আজ যুব ও ছাত্রসমাজ সচেতন হয়ে গেছে। আজ তার দলের কর্মীরা পুলিশ মেরে বিপ্লব হবে না। শিক্ষায়তন ধ্বংস করে বিপ্লব হবে না। একথা বলেছেন এটা যদি সেদিন স্মরণে থাকত যেদিন ৬৬'র শীতের দুপুরে প্রেসিডেন্সী কলেজের ল্যাব বটনী পুড়ে ছাই হোল। মদনপুরে ইলেকট্রিক ট্রেন জলে ছাই হল তাহলে হয়ত বাংলার যুবসমাজ একটা ধ্বংসাত্মক পথে এগিয়ে আসত না। জানি দেশে দারিদ্র্য আছে, জানি বেকার আছে জানি পীড়ন আছে কিন্তু সমস্যা সমাধানের জন্য 'সর্বহারার একনায়কত্ব, গণতন্ত্র, পার্লামেন্ট, সশস্ত্র বিপ্লব, গান্ধীবাদ এর কেউই কি নীতি নিয়ে তার দলের দায়িত্ব পালন করেছেন। কৃষিবিপ্লবের কাজ শুরু করার আগেই যখন দেখি শিক্ষায়তন ধ্বংস হচ্ছে তখনই বুঝে গেলাম সশস্ত্র বিপ্লবীদের রাজনৈতিক নিষ্ঠা নেই মাও এর চিন্তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার অনুধাবনকারীরা ভারতের মাটির ভাবটাকে একবারও শুকলেন না একবারও দেখলেন না যে সুলতান মামুদ মন্দির ধ্বংস করলেও বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঠেকিয়ে রাখা যায় না একবারও দেখলেন না যে দাবী যতই হোক ঈদের দিনে ঈদ মোবারক জানাতে হিন্দু মুসলমান এক জায়গায় গিয়ে-থাকে। একবারও বিচার করলেন না সামাজিক বিবর্তনের পুরোধা রামমোহন, বিদ্যাসাগর এই মাটির সঙ্গে মিশে আছেন। কাজেই পরীক্ষিত সত্যে যে তত্ত্ব এসেছে তাকে প্রয়োগ করতে গিয়ে অবলম্বন করতে হচ্ছে বাংলার ও বাঙালীর হতাশাকে ও দুঃখকে। কিন্তু দুঃখ জয়ের জন্য যদি অন্য পথের নিশানা নুতন করে বাংলাদেশ পায় তাহলে কি রোজ হোলি খেলে হাত বাড়াতে চাইবে?

কখনোই না, আজ বিপ্লবীরা যদি ভেবে থাকেন যে গলা কাটা একমাত্র তাদের বিপ্লবের পথ তাহলে ওই সব বিপ্লবীরা নেহাৎ নির্বোধ ছাড়া আর কিছুই না।

ভারতের মুক্তি আন্দোলন
এবং
শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক চেতনা ও "ভারত-বাদ"

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সাধারণ সম্পাদক)
পার্ট ওয়ান পরীক্ষার্থী, অর্থনীতি

বিগত শতবর্ষকাল ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবদমিত, শোষিত, নিষ্পেষিত মানবশ্রেণীর মুক্তি আন্দোলন দেশকে পরাধীনতা মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে—এমন নজীর যথেষ্ট পরিমানে পাওয়া যায়। মুক্তিকামী মানুষদের নেতৃত্ব দিতে ক্ষণজন্মাব্যক্তিদের আবির্ভাব ও আত্মপ্রকাশে পৃথিবীর মাটি ধন্য হয়েছে বার বার। পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তের মুক্তিকামী মানুষদের বৈপ্লবিক আন্দোলন কম বেশী একই খাতে, একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। সংযোগ রহিত অথবা সংযুক্ত এই বিপ্লবের ধারা মূলতঃ একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, রক্তক্ষরণ যার মূলসূত্র। বলা বাহুল্য, মহান ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা এক বৈশিষ্টপূর্ণ ব্যতিক্রম, অন্যান্য দেশের নেতৃবৃন্দের সংগে আমাদের এদেশের নেতৃবৃন্দের চারিত্রিক ব্যতিক্রমও লক্ষণীয়—এই ব্যতিক্রমের কারণ ভারতবর্ষের আকাশ, বাতাস, মাটি, শাশ্বত প্রেম ও অহিংসার বীজমন্ত্র। শংকর নানক-নিমাই-বুদ্ধের ভ্রাতৃপ্রেম বৈপ্লবিক-চৈতন্যও ফল্গুধারার মত জাগ্রত ছিল। এই বিশ্ব-জনীনতা, সার্বিক আত্মীয়তার পথেই ভারতের মুক্তি আন্দোলন, কখনো কখনো বাধা প্রাপ্ত হলেও, ক্রমশ অগ্রসর হয়ে অবশেষে সার্থকতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাই ভারতবর্ষের মাটিতে সহিংস বিপ্লবের পাশাপাশি অহিংস বিপ্লবের কর্মসূচীও প্রতিপালিত হতে থাকে। প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সংগে 'বার্লিন কমিটি'র সংগে তদানীন্তন জার্মান সরকারের যে গোপন চুক্তি হয় তাতে ভারতে সহিংস বিপ্লবের কথাই প্রশ্রয় পেয়েছিল। গান্ধীজীর ছিল ভিন্নমত। তিনি মনে করতেন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে, অসহযোগের মাধ্যমে স্তরে স্তরে অন্যায়ের প্রতিরোধ করা উচিত। তিনি মনে করতেন, যুদ্ধ হল অত্যাচারের মাধ্যমে একদলের ইচ্ছা অন্যদলের উপর চাপিয়ে দেওয়া। তাঁর মৌলিক বিশ্বাস ছিল, সব মানুষই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধা। তিলক এবং অরবিন্দ দু'জনেই ছিলেন চরমপন্থী। এবং সশস্ত্র পন্থা গ্রহণে তাঁদের কোন নৈতিক বা মৌলিক আপত্তি ছিলনা। তবুও ভারতের অবস্থা বুঝে তাঁরা সশস্ত্র পন্থাকে কংগ্রেসের পন্থা হিসাবে গ্রহণ করতে বলেন নি। অরবিন্দ গান্ধীজীর প্রতিরোধ পন্থাকে নাম দিয়েছিলেন সক্রিয় বা প্রতিরোধমূলক প্রতিরোধ—Aggressive or Defensive Resistance—সরকারী শিক্ষালয়, আদালত, কাছারি, পুলিশ, জমির খাজনা দেওয়া প্রভৃতি বর্জন করা। রুশ বিপ্লবের জনক মার্কসের অভিমত উৎপাদন ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটছে, ক্ষমতাও হস্তান্তরিত হচ্ছে এক শ্রেণীর হাত থেকে অন্য শ্রেণীর হাতে। ফলে, হিংসা ও রক্তপাতের মধ্যে বার বার শ্রেণী সংগ্রাম ঘটছে। মার্কসবাদের লক্ষ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া ও মেহনতী মানুষের অধিকতর ক্ষমতায় অধিকারী হওয়ার অবস্থা করে দেওয়া। গান্ধীজীর মত—শ্রমজীবি মানুষদের দানে সমাজ ও দেশ সমৃদ্ধ হয়। তাই দেশের দায়িত্ব তথা আগামী পৃথিবীর দায়িত্ব তাদের উপরই ন্যস্ত হওয়া উচিত। টলষ্টয়ের মত গান্ধীজীও মনে করতেন সমাজে যারা পরশ্রমনির্ভর

ওরই কি আপনার কাম্য ? আমার প্রশ্ন—সন্তানলাভের জন্য দেবতার কাছে বলি মানত করলে সেই
দেহ নিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে না ?

ার করি, আমাদের সমাজে ক্রটি আছে, কিন্তু তাকে উপযুক্ত সন্ধানে করে তুলতে হবে উন্নত। গড়ে
ন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে সম্পূর্ণ বিজাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো চাপিয়ে দিয়ে
উপর সেটা আমাদের অবশ্যই কাম্য নয়। সেদিন তাকে শুদ্ধ করা সম্ভব হয়নি বলে আজকের সমাজ
াই কি এর প্রতিকার ?

জারজ সন্তান' জন্মলাভ করে অধর্মের জয়ধ্বজা তুলে, তাই আজ নবজাতক কে বধ করেই অধর্মকে শুদ্ধ
ার রক্ত থেকে পাশবিকতার বীজ নির্মূল করতে হবে উপযুক্ত সন্ধানে। সেই দিনই হবে অধর্মের
বিধর্মী সন্তান হয়ে উঠবে রূপান্তরিত সামাজিক মানুষ। তাই সেদিন ঘরে ঘরে উন্মত্ত তাণ্ডব চলছিল,
জলে, শত স্ত্রীর স্বামীবিয়োগের বেদনার সঙ্গে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদেছিল। পুঞ্জীভূত
ী হয়েছিল, উগ্রপন্থীদের মৃত্যুবাণ—জনমত। আজ তারই নিষ্ঠুর নির্মম আঘাতে ইতিহাসের জঞ্জাল
রেই তলিয়ে গেল যারা, তাদের অনেকেই হয়ত বলতে চেয়েছিল—জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি
াদের দরদী নেতারা সেইসব কর্মীকে সে অধিকারটুকুও দিল না। আগামী দিনের ইতিহাস তাদের

ল পরিবর্ত্তন কিসে হবে ? প্রাণের শরীরের পুরাতন প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে হবে,
ক নয়।

শ্রীঅরবিন্দ

জগতের মহান পুরুষকে যিনি কম্বুকণ্ঠে একদা ঘোষণা করেছিলেন—"আগামী পঞ্চাশ বৎসর কাল তোমরা আর কোন দেবদেবীকে অন্তরে ঠাঁই দিও না। এখন একমাত্র জাগ্রত দেবতা হচ্ছেন আমাদের এই জাতি, আমাদের পূজার প্রথম অর্ঘ্য নিবেদন করব তাদের কাছে যাঁরা আমাদের স্বদেশবাসী।" এই অসামান্য পুরুষের মৃত্যুর অব্যবহিতকাল পরেই শুরু হয় স্বদেশী আন্দোলন। স্বামী বিবেকানন্দ কোনও রাষ্ট্রনেতা ছিলেন না বা কি দক্ষিণ পন্থী কট্টর রাজনীতিবীদ ছিলেন না। বরং একজন আধ্যাত্মিক জগতের মহান পুরুষ ছিলেন যাঁর মধ্যে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক—সামাজিক চিন্তা বিদ্যমান ছিল। এই সমাজ সচেতনতা বা রাজনৈতিক চিন্তা অনাদি-অনন্ত কালের ভারতীয় চিন্তাধারার সোনালী ফসল স্বামী বিবেকানন্দ পরমপুরুষ রামকৃষ্ণের সাহায্যে ভগবতী দর্শন করেছিলেন আর শ্রীঅরবিন্দ দর্শনলাভ করেছিলেন বাসুদেবকে। দু'টি ভিন্নমুখী চরিত্রের আশ্চর্য্য মিলন ঘটেছে একটি মাত্র জায়গায় যা বিরল মাত্র নয়, অবিশ্বাস্য রকম বিরল।

মার্কসীয় বিপ্লব ও গান্ধীজীর অহিংস বিপ্লব এর মধ্যে তফাৎ কেবলমাত্র পদ্ধতি ও প্রকরণগত। গান্ধীজীর বিশ্বাস ছিল স্ব স্ব আত্মার উন্নতি ব্যতিরেকে কেবলমাত্র বাহ্যিক পরিবর্তনের দ্বারা দেশের মঙ্গলসাধন সম্ভব নয়। শ্রীঅরবিন্দের অভিমতও একই রূপ। বেদান্তের আত্মার কথা প্রচার করা বা আত্মার উন্নতি করা আর পরাধীনতার শিকল ভাঙ্গা এক কথা নয়। কিন্তু সেই আত্মিক শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীরা চার্চিলের বারুদকেও নিষ্প্রভ করে দিয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ ভারতবর্ষে ফিরে এসে বরোদায় শান্তিময় পরিবেশে ক্রমশঃ আত্মস্থ হন। এই আত্মমগ্নতা বা ভগবৎ চিন্তায় প্রলীন হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। দেশমাতৃকার বোধন। আত্মমুক্তি তিনি চাননি, চেয়েছিলেন দেশের পরাধীনতার থেকে মুক্তি। যেহেতু রাজনৈতিক কৌশল দ্বারা সমস্যার চিরকালীন সমীকরণ সম্ভব নয় সেইহেতু আধ্যাত্মিকতার পথকেই তিনি আশ্রয় করেছিলেন। জগতের অবিরাম সংগ্রাম ও সংঘর্ষ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—"The eater eating being eaten—'খাদক খাদ্যে পরিণত হচ্ছে।' প্রাণী জগতের দুঃখ কষ্টকে অরবিন্দ অস্বীকার করেননি। খ্রীষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষেরা দুঃখকে বরণীয় বলেছেন। শংকরাচার্য্য প্রমুখ বৈদান্তিকরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন—'ব্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা,' বুদ্ধদেব আদর্শ দিয়েছিলেন 'নির্বাণের।' কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ বৈরাগ্যেও নয়, সন্ন্যাসেও নয়। তিনি বলেছেন—' এখন বুদ্ধি মেনেছে সন্ন্যাস চাই না। সংসারে থেকে ত্যাগী সংসারী হতে বল। তোমরা কামনা ত্যাগের আদর্শ বুঝেছ, কিন্তু কামনাত্যাগ আর আনন্দভোগের সামঞ্জস্য পূর্ণভাবে ধরতে পারনি।" সাধু সন্ন্যাসীরা বলে থাকেন, আধ্যাত্মিক জীবনই প্রকৃত জীবন। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—কেবল আধ্যাত্মিক জীবনই নয়, আমাদের চাই তার থেকে বড় রকমের জিনিষ—'দিব্য জীবন।' আমাদের চাই 'পূর্ণ চেতনা'—সেই 'পূর্ণ চেতনা' যতকাল না মিলছে ততকাল আমাদের জীবনও অপূর্ণ থেকে যাবে।"..."এই দিব্য জীবন লাভে বহু উদ্দেশ্য কেবল যোগী, সন্ন্যাসী কিম্বা ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে ব্যক্তিগত আনন্দ সাগরে নিমগ্ন থেকে নিজের জন্যই একটা মোক্ষলাভের উপায় করে নেওয়া নয়, নিজের কাছাকাছি জনকয়েকের জন্যও নয়, সকলেই যাতে তার সুফল লাভ করতে পারে তার জন্যে।" তবে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আয়ত্ত করতে হবে দিব্য জীবনকে এবং ব্যক্তিগত সাধকের অর্জিত উচ্চতর চেতনার আলো বিচ্ছুরিত হবে, সঞ্চারিত হবে বিভিন্নের মধ্যে এবং অনেক সাধকের সাধনায় দিব্য জীবন যখন বাস্তব হয়ে উঠবে, তখনই সম্ভব 'চেতনার রাজ্য' প্রতিষ্ঠা করা। এই 'দিব্য জীবন' ও 'অতি মানবতাবাদের' আদর্শ শ্রীঅরবিন্দের। মনীষী রোমাঁ রোলা

নবজাগরণের অগ্রদূত রামমোহন

শ্রীদুলাল কুমার মিত্র
উপাধ্যক্ষ

আধুনিক ভারতের নবজাগৃতির প্রথম পথিকৃৎ রাজা রামমোহন। আধুনিক বাঙালী জীবন এবং আধুনিক বাংলা ভাষার ইতিহাসে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের দৃঢ় পদক্ষেপে যিনি সংকল্পের স্থির চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিলেন তিনি রামমোহন। জাতির জীবনে সেদিন নবতর সৃষ্টির জন্য মহতী এক প্রেরণার প্রয়োজন হইয়াছিল—তাই সাহিত্যে এবং জীবনের মধ্যে এইরূপ বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব বিরাট অভিনন্দনে ধন্য হইয়া উঠিল। নবীন বাঙালী জীবন যখন নবতর সংস্কৃতির বাণীরূপ কামনা করিতেছিল, স্বপ্নদ্রষ্টা জীবন শিল্পী রূপেই রামমোহন তখন বাংলা ভাষা ও বাঙালী জীবনে আনিলেন নবীন প্রেরণার দোলা। অটুট সংকল্প এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠা মিলিত হইয়া রামমোহনের পদক্ষেপ বাঙালী জীবনকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। বৈদিক শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার নব অনুরাগ দেশীয় জীবন ভূমিতে নবীন ধর্মবোধ রচনার ব্রতে উদ্বুদ্ধ হইল।

রামমোহনের সংগ্রাম ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে ছিল দ্বিমুখী। একদিকে তিনি স্বজাতি ও স্বজনদের অন্ধ সংস্কারের অচলায়তনে করিয়াছিলেন আঘাত, অন্যদিকে বিদেশী ধর্মযাজকদের অকারণ কটাক্ষের বিরুদ্ধে করিয়াছিলেন স্বধর্মের মূল্য প্রতিষ্ঠা। রামমোহনের এই দ্বিমুখী কর্মধারার মূলে ছিল তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রবল সত্যাসক্তি, আর প্রবলতর স্বাভিমান। সত্যের প্রতি অটুট আস্থা লইয়া তিনি জাতির জীবনে মিথ্যার জালকে করিয়াছিলেন ছিন্ন ভিন্ন; অপর পক্ষে প্রবল স্বাভিমান ও স্বজাতি প্রীতির বশে পরদেশীদের অন্যায় নিন্দা-চেষ্টার করিয়াছিলেন প্রতিরোধ। রামমোহনের ব্যক্তিত্বের আরো একটি বলিষ্ঠ উপাদান তাঁহার তীব্র মানবপ্রেম। মানুষ তাঁহার কাছে ঈশ্বরের সন্তান এবং সেই কারণেই মানবপ্রেম ছিল তাঁহার কাছে শ্রেষ্ঠ সাধ্য। আমাদের সমাজে তখনকার দিনে মানুষের চরম অবমাননা পুঞ্জীভূত হইয়াছিল নারী জীবনের মর্মমূলে। গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জন নিরোধ ও সতীদাহ নিবারণ চেষ্টার মহৎ ব্রত পূর্ব কথিত দুই চেষ্টার সহিত যুক্ত হইয়া রামমোহনের সংগ্রামকে করিয়াছে ত্রিপথগামী। আর এই সংগ্রামে তাঁহার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ছিল গভীর হৃদয়ধর্ম, দীপ্ত মনীষা, এবং ক্ষুরধার লেখনী।

স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী সহমরণ না করিলে ভবিষ্যতে ব্যাভিচারিনী হইবার আশঙ্কা থাকিতে পারে বলিয়া একদল লোক যখন বাধা নিষেধের জিঞ্জীর তুলিল, রামমোহন তাহার প্রতিবাদে দৃঢ় হস্তে কলম ধরিলেন। নিম্নলিখিত রচনাংশ হইতে তাঁহার প্রতিবাদ এবং রচনার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারা যাইবে—

"কেবল ভাবী আশঙ্কাকে দূর করিবার নিমিত্তে এরূপ স্ত্রী বধে পাপ জানিয়াও নির্দয় হইয়া জ্ঞানপূর্বক প্রবর্ত্ত হইতেছ তবে ইহাতে আমরা কি করিতে পারি কিন্তু ব্যভিচার আশঙ্কা পতি বর্ত্তমান থাকিতেই বা কোন না আছে বিশেষতঃ পতি দূরদেশে বহুকাল থাকিলে ঐ আশঙ্কার সম্ভাবনা কেন না থাকে অতএব সে আশঙ্কা নিবৃত্তির উপায় কি করিয়াছ" (সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ।)

তারা অবাঞ্ছিত, সমাজের বা দেশের কোন কিছুর উপর তাদের অধিকার নেই। তাই পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার কথা তিনি ঘোষণা করেছিলেন। ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের আগে চাই বিদেশী মুক্ত স্বদেশ। তাই ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে আরম্ভ হ'ল "প্রতিরক্ষামূলক প্রতিরোধ।" ক্যালেণ্ডারের পাতায় তখন ১৯০৫ সাল। এই পটভূমিতে শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতিতে আবির্ভাব।

১৯০৫ সাল। লর্ড কার্জনের অভিসন্ধি বঙ্গভঙ্গ রদ করতে সারা বাংলা অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পরাজিত হন বিদেশী শাসক। শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৬ সালে বাংলায় চলে আসেন। "বন্দেমাতরম্" কাগজের দায়িত্ব গ্রহণ করার অনতি-কাল পরে রাজদ্রোহের অভিযোগে ধৃত হন এবং সন্দেহের অবকাশে মুক্তি পান। সম্ভবত শ্রীঅরবিন্দের জীবনে রাজদ্বার পরিদর্শন এই প্রথম। বিশ্বকবি শ্রীঅরবিন্দের সত্তায় অগ্নিগর্ভ ভিন্নভিয়াসকে প্রত্যক্ষ করে 'নমস্কার' কবিতায় নিবেদন করলেন—"হে অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার,"। সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে কবি পূর্বাহ্নেই কবি চির বিদ্রোহী কবিকে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করে জাতিকে ঋণ মুক্ত করে গেছেন। শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণ স্বরাজ'এর দাবী পেশ করলেন। মুরারী পুকুর বোমার মামলায় (আলিপুর বোমার মামলা নামে সমধিক পরিচিত) ধৃত হলেন অরবিন্দ ও আরো পনের জন। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অরবিন্দের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল—If to preach fredom is a crime, then I am a criminal and let me be punished. But fredom does not mean the use of violence—it does not mean bomb it is fulfilment of our seperate national existence. ভারতবর্ষের কোমল পেলব মাটির মানুষের মুখেই এমন কথা উচ্চারিত হওয়া সম্ভব। সম্ভব শ্রীঅরবিন্দের মত আধ্যাত্মিক প্রেরণায় উদ্বোধিত অতিমানবীয় স্তরে উত্থিত মানুষের পক্ষে এমন কথা নির্ভীকভাবে উচ্চারণ করা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মুক্তি-আন্দোলনের কোন নেতার মুখে এমন 'হৃদয়-মথিত করা বাণী' ইতিপূর্বে শোনা গেছে বলে জানিনা। পৃথিবীতে অন্য কোন দেশের মানুষ মাটিকে মা বলে ভাবেন কিনা বুঝিনা—যদিও Mother land শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ একই—তথাপি ভারতের কবির মত ব্যাকুল চিত্তে বলতে পেরেছিল কিনা—

"ভারত আমার, ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র,
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।"

—অথবা কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃতে'র—"ভারত ভূমিতে হৈল জন্ম যার, জন্ম সার্থক কর, করি পর উপকার।" রবীন্দ্রনাথের—"বাংলার মাটি, বাংলার জল পুণ্য হউক, হে ভগবান!" কবি স্বয়ং এই কবিতা অনুবাদ করে লিখেছেন—ভারতের মাটি, ভারতের জল পুণ্য হউক হে ভগবান। কবির কাছে বাংলার মাটি ও জল আর ভারতের মাটি ও জল এক ও অভিন্ন। একই সত্তার পূর্ণ সমগ্রতার মধ্যে আশ্রিত দুইটি রূপ। ভিন্ন নয়, পৃথকও নয়, মালার ফুলের মতো একাঙ্গীভূত সত্তা।" এই ভাবেই "ভারত বোধ" থেকে "ভারতবাদ" এর উৎপত্তি। আর এই ভারতবাদ আপন স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। ভারতবর্ষের যুগ-যুগান্তের সাধনা ও সংস্কৃতির সংগে, ভারতের আধ্যাত্মিকতার সংগে, বেদান্তের মূল সূত্র আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করার সংগে—বর্তমান জগতের জড়বাদ, বস্তুবাদকে একত্র করে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের বিনিয়োগের প্রতিফলন নতুন এক ধারার নাম 'ভারতবাদ।' এই অহিংসা প্রেম-মৈত্রীর মাটিতেই 'ভারতবাদ' এর জন্ম সম্ভব। সম্ভব বলেই এই দেশের মাটিতে রাজনীতি—সামাজিক ক্ষেত্রে দেখা যায় আধ্যাত্মিক

শরৎচন্দ্র— সে যুগ, এ যুগ

চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্য
বিজ্ঞান, দ্বিতীয় বর্ষ

উদ্ধৃতির অন্ধ পুনরাবৃত্তিতে আর সমাজের তথা কথিত বড় মানুষদের বহু ঘটা করে দেওয়া দামী দামী মালা এবং বিবিধ বিশেষণ খচিত অভিনয়শুলভ বিস্তারিত বক্তৃতার বেড়াজালে আজ দেশ বিদেশের মণীষীদের শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নাম করে সজ্ঞানেই হোক্ আর অজ্ঞানেই হোক্ নিজেরাই আদতে আত্ম-প্রবঞ্চনার দুর্গন্ধময় পঙ্কিল আবর্জনাস্তূপের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছি। আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েও প্রশ্ন নেই—কোথায় আমরা? কীই বা পরিণতি—? যতই দুঃখের, যতই বেদনার, যতই লজ্জার কথা হোক না কেন এ কথা স্বীকার করতেই হবে হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে হৃদয় দিয়ে তাঁদের যথার্থ মূল্যায়ণ করতে আমরা পারিনি। তাই আজও বর্ত্তমান সমালোচকদের দেওয়া 'এক দরদী—কথাশিল্পী—' শরৎচন্দ্রের এই পরিচিতি নিয়েই আমরা তুষ্ট। —কিন্তু এই কি আসল শরৎ পরিচিতি? ইতিহাস কী বলে? এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর এবং তাকে হৃদয়ঙ্গম করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। তাই নিজস্ব সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় স্বল্প পরিসরে দু'একটি কথা বলতে চাইছি।

কোনো মণীষী বা চিন্তানায়কের যথার্থ মূল্যায়ণ করতে গেলে প্রথমেই মনে রাখা দরকার একটি যুগে যা সত্য, বা সমাজ প্রগতির অর্থে প্রগতিশীল বস্তু জগতের নিয়ত পরিবর্তনের জন্য আর একটা যুগে এসে পরিবেশের ভিন্নতার দরুণ আপেক্ষিক বা মিথ্যা হয়ে পড়ে— সর্বযুগের সর্বকালের সাহিত্য, দর্শন বা চিন্তা বলে কোনো বস্তু নেই। তাই শরৎচন্দ্রের যথার্থ মূল্যায়ণ করতে হলে তাঁর যুগ সম্পর্কে সম্যক্ উপলব্ধির প্রয়োজন আছে।

শরৎচন্দ্রে আবির্ভাব এমন একটি যুগে, যা ভারতবর্ষের এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ— সামন্ততান্ত্রিক রীতিনীতিকে ভেঙ্গে নতুন আদর্শ নতুন রীতি প্রতিষ্ঠার যুগ। ভারতীয় নবজাগরণের এই যুগে, প্রচলিত রীতিনীতি, কুসংস্কার এবং সমস্ত Conventional outlooKকে ভেঙ্গে ও সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিয়ে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা এই তিন দাবীর ভিত্তিতে নতুন আদর্শবোধ, নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার যুগে বিভিন্ন মণীষী ছাত্র, যুব ও জনসাধারণের কাছে বিভিন্ন মত ও পথের উপস্থাপনা করেছিলেন। অবশ্য তন্মধ্যে মূলতঃ দুটি ধারাই ছিল প্রধান। প্রথমটি হোল আপোষকামী দ্বিধাগ্রস্ত, বিপ্লবভীত সংস্কারপন্থী বিরুদ্ধবাদী (reformist oppositonal) ধারা— যা জাতীয় নেতৃত্ব এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সীমাবদ্ধতার দরুণই গড়ে উঠেছিল এবং এটিই এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রধান হিসাবে appear করেছে। তৎসত্ত্বেও Subordinate হলেও এরই পাশাপাশি আর একটি ধারা ছিল—যেটি আপোষহীন, ধর্মবিরোধী যুক্তি ও বিজ্ঞানের উপর দাঁড়িয়ে Agnostic secluar মানবতাবাদের বিপ্লবাত্মক রূপ নিয়ে অবতীর্ণ— যার বলিষ্ঠ প্রতিনিধিত্ব করে গেছেন শরৎচন্দ্র তাঁর লেখনীর মাধ্যমে।

হাজারো বছরের কুসংস্কার এবং কূপমণ্ডুকতার পঙ্কে নিমজ্জিত বিদেশী শোষণ, অত্যাচার, অবমাননার যাঁতাকলে পিষ্ট ভারতবাসী মুক্তি যে ধর্মবিরোধী যুক্তিভিত্তিক মননের দ্বারাই সম্ভব তা শরৎচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন। তাই

শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে বলেছেন—"He was the real intellectual heir of Vivekananda..... His nation was to be the servant of humanity—not by force of arms but by the force of spirit.

রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দের উত্তরসূরী শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক-চিন্তার মূলে রয়েছে সেই একই সূত্র "মানব জীবনের উন্নতি।" তাঁর হৃদয়ে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব আর বিশ্ব-মিলনের গঙ্গা-যমুনা প্রবাহিত। আর সেই চিন্তার প্রচ্ছায়ায় তিনি সযত্নে পালন করছেন 'One world' বা 'অখণ্ড পৃথিবীর' স্বপ্ন। এই শান্ত সমাহিত অখণ্ড পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন দার্শনিক প্লুটো, তিনি ব্যক্ত করেছিলেন—One day the world will be Governed by the Philosopher—যখন আর পৃথিবীতে অশান্তি থাকবে না। রাজনৈতিক চেতনা ও আধ্যাত্মিক ভাবনার প্রতীক শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েছেন। ····আমার মন বললে, ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বালাবেন। ····আমি তাঁকে বলে এলুম আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন—এই অপেক্ষায় থাকব। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে····· ···।'

প্রথমে তপোবনে শকুন্তলার উদ্বোধন হয়েছিল যৌবনের অভিঘাতে, প্রাণের চাঞ্চল্যে। দ্বিতীয় তপোবনে তাঁর বিকাশ হয়েছিল আত্মার শান্তিতে। অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলাম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—"হে অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।"

জনসাধারণের শৌর্য্য বীর্য্য বীরত্ব যে কোন দেশের মুক্তি আন্দোলনের প্রধান আশ্রয়। মুক্তি আন্দোলনের এই সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাবার জন্য চাই সঠিক নেতৃত্ব। এই সঠিক নেতৃত্ব না দিলে রুশ-বিপ্লব সম্ভব হত কি? মহান লেনিন ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করতেন কি? কাভুর, গ্যারিবল্ডি, ম্যাজিনিকে বাদ দিয়ে ইটালির বিপ্লবের কথা চিন্তা করা যায় কি? ভলটেয়ার ও রুসোর লেখনী কি ফরাসী বিপ্লবের নেপথ্যনায়ক নয়? বিসমার্ক এর কথা বাদ দিয়ে নতুন জার্মানীকে ভাবা যায় কি? এঁরা প্রত্যেকেই আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান। সময়ের হাত ধরে সময় এগিয়ে চলেছে—জগৎ বিজ্ঞানশক্তির আধার হয়ে উঠেছে, আধুনিক মারনাস্ত্র আজ প্রতি ঘরে ঘরে, তাই শ্রীঅরবিন্দের জন্মশতবর্ষে আমার ব্যক্তিগত চিন্তা যে বর্ত্তমান যুগে দেশের অভ্যুদয়ের হাতিয়াররূপে কোনটা শ্রেয়—সহিংস বিপ্লব না শ্রীঅরবিন্দের 'ভারতবাদ'?

ভ্রষ্ট হয় সেখানে বিচ্ছেদের মধ্যেই প্রেমের সার্থকতা। আর যে মিলন সমাজ প্রগতির সংগ্রামে ও কর্তব্যে উভয়কে উদ্বুদ্ধ করবে—যেখানে কুরুচিতা এবং গ্লানির কোনো স্থান থাকবে না—সেখানে মিলনেই প্রেমের সার্থকতা—ত বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে হলেও তাকে গ্রহণ করতে হবে। তিনি দেখিয়েছেন কেবল নিজ গর্ভজাত সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ ভালবাসা নয় কেবল তারই সুখসমৃদ্ধিকে আশা করা নয়—সমস্ত সন্তানের প্রতি মায়ের সমান দরদবোধই যথার্থ মাতৃত্ব। তাই তাঁর কাছে convetional mothor hood তেমন আকাঙ্খিত নয় ethical mother hoodকেই তিনি বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করেছেন—পল্লী সমাজে 'রমা' 'রমেশের' প্রতি 'বিশ্বেশ্বরী'র স্নেহ মমতা যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ—বিন্দুর ছেলেতেও একই কথা তিনি বলতে চেয়েছেন।

মানবতাবাদ ও বিশ্ব-মানবতাবাদ—এর প্রশ্নেও শরৎচন্দ্র যে দিকগুলিকে নির্দেশ করেছেন তাও লক্ষণীয় বিষয়। মানব সমাজের প্রতি অসীম দরদবোধ এবং তার অগ্রগতির পথকে কন্টকমুক্ত করার সংগ্রামকে এড়িয়ে কেউ বড় হতে পারে না। সমস্ত জনসাধারণের প্রতি অসীম দরদবোধের ভিত্তিতেই সকল যুগে সকল মণীষীর আবির্ভাব। শরৎচন্দ্রও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি দেখিয়েছেন শুধু এই দেশের মুক্তি নয়, চাই বিশ্ব-মানবতার মুক্তি—তবে দেশের মুক্তির সম্পূর্ণতা ব্যতিরেকে বিশ্বমানবতার মুক্তি হয় না—বিশ্বমানবতার মুক্তি দেশের মুক্তির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়—যা ছিল অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণা—তার মূল্যকে আমরা আজকের যুগেও অস্বীকার করতে পারিনা। তাঁর সৃষ্ট 'পথের দাবী'র রামদাস বলেছেন—'এ কেবল ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্মরক্ষার লড়াই।'—এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই, হিন্দু নেই, মুসলমান নেই—জৈন শিখ কোন কিছুই নেই—আছে শুধু ধনোন্মত্ত মালিক আর প্রবঞ্চিত অর্দ্ধভুক্ত শ্রমিক।' 'তরুণের বিদ্রোহে' আরও পরিষ্কার করে বলেছেন—"এখন রাজা নেই, আছে রাজশক্তি, এবং সেই শক্তি আছে জনকয়েক বড় ব্যবসাদারের হাতে। হয় স্বহস্তে করেন নতুবা লোক দিয়ে করান। বনিক বৃত্তিই এখন মুখ্যতঃ রাজনীতি। শোষনের জন্যই শাষন। নইলে তার বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।" তাঁর শিল্পী সুলভ মনের চিন্তিত 'সব্যসাচী'র প্রয়োজন আজ দেশে দেশে—প্রয়োজন শাশ্বত সত্য বিচার, 'সামাজিক কল্যাণ অকল্যাণ', আপেক্ষিক ন্যায়নীতির ধারণা', 'সতীত্ব' ও 'নারীর অধিকার' বিচারের ক্ষেত্রেও। বর্তমান সামাজিক ও সাংস্কৃতির আন্দোলনের কর্মীদের সম্মুখে এ এক আদর্শ স্বরূপ—সত্যের মঞ্চে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কী ভাবে প্রতিবাদ করে গেলেন সারাটি জীবন ধরে।

শুধু এই নয়, জীবনের আরও বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে (এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরতার জন্য যার অবতারণা সম্ভব হলো না) তাঁর এই একই চিন্তার প্রতিফলন বহু জায়গাতেই পাওয়া যায়। তিনি দেখিয়েছেন কাউকে ছোট করে নয় ব্যক্তিগত স্বার্থকে আঘাত দিয়ে নয় -অপরকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে অপরের কল্যাণে নিজেকে মগ্ন রাখাতেই মানুষের প্রকৃত আনন্দ। এই সব থেকে স্পষ্টতরই বোঝা যায় তিনি কেবল দরদী কথাশিল্পীই ছিলেন না—তিনি ছিলেন একাধারে সমাজ সংস্কারক,দার্শনিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবীদ। অবশ্যি অনেক যশস্বী সমালোচক বলে থাকেন যে তাঁর লেখার মধ্যে নাকি কোন Intellect এর পরিচয় পাওয়া যায় না। Intellect এর প্রকৃত অর্থ যদি Faculty of Knowing and reasoning অর্থাৎ যুক্তিবিচার ও বুদ্ধিসত্বাকেই বোঝায় তাহলে বস্তুতঃ শরৎচন্দ্রই সেযুগের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখেন—তা তথাকথিত সমালোচকরা স্বীকার করুন আর না করুন।

কালের হাতে রামমোহনই ছিলেন অব্যবহিত পরবর্তী যুগে অভ্যুদিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মুক্তিদূত। বাংলা গদ্যে ব্যক্তিত্ব স্পর্শ ঘটিয়াছিল প্রথম রামমোহনের হাতে, রামমোহনের রচনায় প্রথম দেখিয়াছি বিচারমূলক জীবন জিজ্ঞাসা, বিশ্লেষাত্মক আত্ম-সন্দর্শনের আকাঙ্খা। রামমোহনের রচনায় সামাজিক রেণেশাঁর বার্তা ধ্বনিত হইয়াছে—তাহারই অনুবর্তনে রামমোহনোত্তর যুগে দেখা দিয়াছে সাহিত্যে রেণেশাঁ।

উনিশ শতক হইতে বাংলার সমাজ ও সাহিত্য-জীবন যুগপৎ আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে নারীত্ব সম্বন্ধীয় নতুন মর্য্যাদাবোধকে কেন্দ্র করিয়া। রামমোহন হইতে বিদ্যাসাগর এমনকি আরো পরবর্তী কাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত বাংলার সমাজ বিপ্লব নারীকেন্দ্রিক—বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ এমনকি শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্য নারীপ্রধান। অতি আধুনিক কালের বিপর্যয়ের পূর্ব পর্য্যন্ত বাংলার জীবন ব্যবস্থা ছিল পরিবার কেন্দ্রিক। আর উনিশ শতকের আলোচ্য সামাজিক বিপ্লবের দিনে নারীর স্নেহ ত্যাগ তিতিক্ষাকে আশ্রয় করিয়াই সমাজ মহামৃত্যুর শেষ ধাপ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। নারীর সেই ধাত্রীমূর্তির প্রতি তাকাইয়া মধুসূদন গদগদ বাক্ রুদ্ধকণ্ঠ, বঙ্কিমচন্দ্র উদ্ভাসিত, ভাবতন্ময়। রবীন্দ্রনাথ নারীর এই কল্যাণী মূর্তির উদ্দেশে তাঁহার সর্বশেষের গানটি নিবেদন করিয়া গিয়াছেন। শরৎচন্দ্র সকল নারীকেই অর্পণ করিয়াছেন অকুণ্ঠ বিশ্বাসের শ্রদ্ধার্ঘ, তাই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—মেয়েদের বিশ্বাস করিয়া ঠকাও বরং ভালো, কিন্তু অবিশ্বাস করিয়া পাপেরভাগী হইতে পারিবনা। নজরুল নারীর মহিমা কীর্তনে সোচ্চার—

সাম্যের গান গাই
আমার চক্ষে পুরুষ রমনী কোন ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যাকিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর,
অর্দ্ধেক তার আনিয়াছে নারী, অর্দ্ধেক তার নর।

নারীত্বের প্রতি এই যে সম্মান ও মর্য্যাদাবোধ ইহার প্রথম অঙ্কুরোদ্গম ঘটাইয়াছেন যুগন্ধর চিন্তাশীল মহানায়ক রামমোহন। বাংলার জীবন-সংস্কৃতির এবং জীবন-জাগৃতির পুরোধা হইয়া সমগ্র জাতিকে অন্ধকার সংশয়াকীর্ণ জীবনের ছিন্ন বেলাভূমি হইতে জীবনের মহৎ উত্তরণের পথে দীপবর্তিকা হস্তে পথ দেখাইয়াছেন রামমোহন। নবজীবন ও নবতম সংস্কৃতির বাণীরূপের সার্থক ভগীরথ রামমোহন—স্বর্গ হইতে জীবন মন্দাকীনিকে মর্ত্যের বেলাভূমিতে অবতরণ করাইয়া কোটি কোটি বাঙালী সন্তানকে দিলেন জ্ঞানের দীক্ষা, সত্যের ইঙ্গিত—দিলেন নারীর জীবন আরাধনার সার্থক সঙ্কেত। বাঙালী জাতি ও বাংলা সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে তাই রামমোহন রায় দ্বিতীয় রহিত।

ছাত্র সংসদ বার্তা

'পথের দাবী'র 'সব্যসাচী'র মুখে শুনি তাঁর দ্বিধাহীন সিদ্ধান্ত— "সমস্ত ধর্মই মিথ্যা— আদিম যুগের কুসংস্কার। বিশ্বমানবতার এতবড় শত্রু আর নেই।" অপার্থিব শক্তি, ব্রহ্ম পরমাত্মা গুরুগম্ভীর বাক্যবিন্যাসকে তিনি নানান লেখায় দ্বিধাহীন চিত্তে বলিষ্ঠভাবে সমালোচনা করে গেছেন। 'চরিত্রহীনে' 'কিরণময়ী' তাই উন্নত মস্তকে বলতে পেরেছেন— "মুখে বলব অব্যক্ত, অবোধ্য, অজ্ঞেয় আর কাজে কথায় তাকে ক্রমাগত বলবার চেষ্টা। ..... যে মুখে বলছেন জানা যায় না সেই মুখেই আবার এতকথা যেন এইমাত্র স্বচক্ষে দেখে এলেন।"

বস্তু জগতের নিয়ত পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ধারাকে তিনি যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাঁর লেখায় চরম সত্য বলেই কিছুই নেই। —"এই পরিবর্তনশীল জগতে সত্য বলিয়া কোন নিত্য বস্তু নাই। তাহার জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। যুগে যুগে কালে কালে তাহাকে নূতন হইয়া আসিতে হয়।" যুক্তি ও বিজ্ঞানের উপর দাঁড়িয়ে সমাজ প্রগতির যা কিছু বাধা বিপত্তি তাকে ভেঙ্গে চুরমার করে লক্ষ কোটী নিপীড়িত মানুষের সুপ্ত জনমানসকে নবমূল্যবোধে উজ্জীবিত করার প্রতিশ্রুতিই ছিল শরৎচন্দ্রের একমাত্র উদ্দেশ্য— "যা অতীত, যা বিগত, সেই শুধু চিরদিন অনাগতের বুক চেপে তাকে নিয়ন্ত্রিত করবে মানবজীবনের এ বিধান কিছুতেই সত্য নয়।"

সমাজ প্রগতির যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ দিয়েছে, তার সাথে আপোষহীন বিপ্লবাত্মক ধারার তেজোদীপ্ত প্রতিনিধি শরৎচন্দ্রের চিন্তার মিল (অনেকাংশে) বোধ করি কারুরই দৃষ্টির অগোচরে থাকে না। ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নে, নারীমুক্তির প্রশ্নে নারীর individual rightকে establish করার প্রশ্নে,— তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, তার ভালবাসার অধিকার, তার প্রেমের অধিকার, তার প্রেমের স্বাধীনতার প্রশ্নে শরৎচন্দ্র তাঁর অনবদ্য চরিত্রচিত্রনের মাধ্যমে যে দিকগুলি নির্দেশ করেছেন তার তুলনা শুধু সে যুগে কেন, আজকের যুগেও বোধ করি মেলে না। আজকের যুগে তথাকথিত প্রগতিবাদীদের সহস্র বাগাড়ম্বরের ছায়ায় মনে গেঁথে থাকা মধ্যযুগীয় চিন্তা ক্ষণে ক্ষণে আঁতকে উঠে শরৎ সৃষ্ট তেজস্বী, সংগ্রামী, সাহসী অথচ বঞ্চিতা 'কিরণময়ীর' কল্পনহীন যুক্তিনির্ভর উক্তিতে। 'পথের দাবী'র সুমিত্রা তার পূর্বজীবনের অন্ধকারকে মহৎ আদর্শ এবং সুস্থ পরিবেশের আলোছায়ায় উদ্ভাসিত করে নতুন জীবনবোধকে কীভাবে উপলব্ধি করেছেন — শুধু তাই নয়, অতিভীরু, কাপুরুষ স্বার্থপর সংস্কারাচ্ছন্ন অপূর্বের মধ্যেও 'ভারতী' কীভাবে সামাজিক দায়িত্ব বোধকে জাগিয়ে তুলেছেন তা আজকালকার নারী সমাজ—যারা স্বাধীনতাকে মনে করেন যা খুশী করার অধিকার, যারা ভালবাসাকে কেন্দ্র করতে চান কেবল আকাঙ্খিত জনের মধ্যেই, যারা সামাজিক দায়িত্ব পালনে চরম ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন—তাদের কাছে এগুলি শেখবার বিষয়—এক জলন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন নারীত্ব, কেবল সতীত্ব আর মাতৃত্ব নয়—নারীর মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশই নারীত্ব। শিক্ষায়, দীক্ষায় জ্ঞানে কর্মে যিনি যোগ্যা—আত্মমর্যাদায়, আত্মনির্ভরতায় যিনি যে কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষের সমকক্ষ এবং সামাজিক কল্যাণে সহস্রকোটী নিপীড়িত মানুষের কল্যাণের সৃজনশীল কর্মের মাধ্যমেই যাঁর স্বাধীনতার আকাঙ্খা সেই আদর্শ নারী—তার মধ্যেই নারীত্বের চরম বিকাশ। তিনি দেখিয়েছেন নরনারীর প্রেম ভালবাসা স্নেহ কিছুই 'প্রবৃত্তির দাসত্ববৃত্তির' জন্যে নয়—কিছুই individual passionকে satisfy করার জন্য নয়—এর যথার্থতা সমাজপ্রগতির সংগ্রামের সাথে idontificationএ। তিনি দেখিয়েছেন কোথাও মিলনে কোথাও বিরহে প্রেমের সার্থকতা। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে যে প্রেম মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারেনা, যে মিলনে সামাজিক কর্তব্য

স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী সপ্তাহের উদ্বোধন দিনে আন্তঃ কলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিচারকগণ ঃ— ছবিতে বাঁ দিক থেকে শেষে— উদ্বোধক অধ্যাপক সৌগত রায় (সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি)।

'জাতীয় সংহতি' দিবসে মনীষীদের আলোকচিত্রে মাল্যদান করছেন শ্রীশোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সাঃ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেস। —শিশির ষ্টুডিও

সবশেষে একটি মাত্র প্রশ্ন রেখেই শেষ করছি। যে শরৎচন্দ্র ভারতীয় নবজাগরণের বিপ্লবাত্মক ধারাকে প্রতিফলিত করে চিরজীবন প্রগতির জয়গান গেয়ে গেলেন—আজকের যুগে, চতুর্দিকে অন্তকাঙ্খিতে ব্যাপক সাংস্কৃতিক অবনমন, নৈতিকতা ও আদর্শের ক্ষেত্রে দ্রুত ক্রমাবনতি, যখন দেখি দেশের সমস্ত মানুষের মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে গিয়েছে—অথচ অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন প্রতিবাদ নেই—যখন ছাত্র, যুব, বৃদ্ধ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত—এককথায় দেশের সকল মানুষই হালকা আমোদ আহ্লাদ ও জৈবিক উত্তেজনাময় অত্যন্ত নিম্নমানের সংস্কৃতির চর্চায় ক্রমাগত নিজেদের ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে—তখন কে হবে সেই আকাঙ্খিত শরৎউত্তরাধিকারী? এই অন্ধ মানুষগুলোকে কে শোনাবে 'নিছক ব্যক্তিগত ধান্দায়' 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' এই মনোভাবে নয়, সামাজিক দায়িত্ব পালনেই মানুষের মনুষ্যত্ব। কে বলবে অন্যায়ের সাথে আপোষ করে এই দেহটাকে বাঁচিয়ে রাখাতে নয়—অন্যায়ের বিরুদ্ধে উন্নত মস্তকে প্রতিবাদ করাতেই যথার্থ আনন্দ ও মনুষ্যত্বের যথার্থ বিকাশ। কোন্ সাহিত্যিক তার ভাষায় রূপ দেবে বঞ্চনার চাপে পিষ্ট শতসহস্র অভয়া' 'রাজলক্ষ্মী'র 'কিরণময়ী'র ব্যথিত হৃদয়ের করুণ আর্তনাদকে—কে মর্যাদা দেবে তাদের ভালবাসাকে—কে মূল্য দেবে তাদের ভালবাসার অধিকারকে?

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে—এ যুগের তথাকথিত সাহিত্যিকদের দেখে ক্ষণিকের আশা জাগলেও, তাঁদের object এবং aim না থাকায় তা নিমেষেই অন্তর্হিত হয়। এঁদের বোধ হয় জানা নেই সাহিত্য মানেই হ'ল বস্তুবাদ এবং জীবন সম্পর্কে স্বচ্ছ মননের জারকরসে বস্তু ও জীবনের প্রকৃত ও সুন্দরতম বিকাশ—যা অবশ্যই মনুষ্য সভ্যতার ভবিষ্যৎ প্রগতির পরিপূরক হবে। অন্ধতার আবেগেই বোধ করি এঁরা সাহিত্যকে ব্যবসায় রূপান্তরিত করেছেন—নীতি, আদর্শ জলাঞ্জলী দিয়ে অশ্লীল অরুচিকর বিকৃত মানসিকতার প্রচারে অবতীর্ণ হয়েছেন। বিজ্ঞান, সাহিত্য বাস্তবতার নামে যৌন উত্তেজনাকর পুস্তিকা প্রকাশ এঁদের ক্রমাগত একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা বেড়েই চলেছে। এর পরিণতি যে কী ভয়াবহ তা বোধ করি এঁদের জানা নেই। ক্রমাগত মানুষের মন এর ফলে হয়ে উঠবে নিম্নগামী—যখন শরৎচন্দ্রের সাহিত্য হয়ে উঠবে মূল্যহীন। —তখন শত সহস্র বঞ্চিতার চোখের জলে এদের কোন অনুভূতিই থাকবে না। হাজারো বেকার দেবদাসের অকালমৃত্যুতে এরা ব্যথিত হবে না—হাজারো শোষিত মানুষের ব্যথিত হৃদয়ের প্রতি এদের করুণারস উছলে উঠবে না—কেবল উন্মাদ নৃত্যের আসরে পসরা জমাবে বড় বড় তত্ত্ব কথা আর বাগাড়ম্বরের প্রাধান্যে।

তাই শরৎচন্দ্রের যথার্থ মূল্যায়ণ তারাই করতে পারে যারা এ যুগে স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোতে উদ্ভাসিত মনন—যা এ যুগের প্রচলিত সমস্যা জর্জরিত সমাজকে ভেঙ্গে নতুন আদর্শবোধের ভিত্তিতে নতুন সমাজ গড়ার উপযুক্ত মনন—তার উত্তরাধিকারী। আজকালকার ছাত্র ও যুবক এই উত্তরাধিকার লাভের জন্য কি সচেষ্ট হবেন না?

সভাপতি যা ভাবেন

দীর্ঘ দুইশত বৎসর ইংরাজ কবল মুক্ত হয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে, আজ থেকে ২৫ বৎসর আগে ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সালে। তারই রজত জয়ন্তী উদযাপনে সমগ্র ভারতবর্ষ আজ মুখরিত। কিন্তু আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে স্বাধীনতার শুভ ফসল ভারতবাসীর সকলের কাছে এখনও পৌছয়নি। আজ রজত-জয়ন্তী বৎসরে দেশের তরুণরা বিশেষ করে ছাত্ররা এই শপথ গ্রহণ করুক যে তারা ভারতের সাধারণ মানুষ,—ভারতের কৃষক, ভারতের শ্রমজীবি প্রত্যেকের কাছে এই স্বাধীনতার অমৃত ফল পৌছে দেবে।

ভারতের নব-জাগরণের চিরস্মরণীয় চিরবরেণ্য মহামানবদের দুইজন হলেন মহাত্মা রামমোহন রায় ও শ্রীঅরবিন্দ। এ বছর রামমোহনের দ্বিশততম এবং শ্রীঅরবিন্দের শততম জন্মজয়ন্তী আমাদের দেশে নানা প্রকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হচ্ছে। মনে হয়, এই রকম কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অথবা তাঁদের প্রতিকৃতিতে মালাদান করে তাঁদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হয় না। তাঁদের আদর্শ ও চিন্তা ধারাকে দেশ গঠণের, জাতী ও সমাজ গঠণের কাজে অরোপ করতে পারলেই হবে তাঁদের প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো।

বর্তমানে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্যোগ চলছে তার সম্বন্ধে বলা কিছু অযৌক্তিক হবে না। শিক্ষা ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা চলছে তারজন্য শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের দোষ দিলে চলবে না। এর জন্য অনেক অংশে দায়ী বর্তমান সামাজিক অবস্থা, লোক সংখ্যা বৃদ্ধি, বেকার সমস্যা, শিক্ষক ও অভিভাবকদের উদাসীনতা প্রভৃতি। শুধু তাই নয় কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের যথাযোগ্য সমাদর, তাদের মেধার যথার্থ মর্যাদা দেশের মানুষ দেয়না, ফলে অনেক মেধাবী ছাত্র বেশী সুযোগ এবং সম্মান পেয়ে দেশ ছেড়ে চলে যায়। এটা উচিত না হলেও এ ছাড়া আর কোন উপায় তাদের সামনে নেই। শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রস্তুতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা—নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠক্রম শেষ করা। পাঠ্য বিষয়ের নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটির দিন কমানো, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতির দিকে সকলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে কোন রকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, শুধু নৈতিক অপরাধ নয় আইন সম্মত অপরাধ বলে গণ্য হওয়া উচিত। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি শিক্ষার্থীদের অবহেলা গুরুতম অপরাধ সন্দেহ নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রম অবনতির অন্যতম কারণ শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের চরম অসম্মান দেখানো। কিন্তু বর্তমান শিক্ষার অবনতির জন্য শিক্ষকরাও বেশ কিছুটা দায়ী। পড়ানোর ব্যাপারে সেই নিষ্ঠা, সেই দরদ আর নেই। শিক্ষকদের মনে রাখতে হবে তাঁদের উপর জাতি গঠণের গুরুদায়িত্ব রয়েছে। সেই দায়িত্ব তাঁদের পালন করতে হবে। সেই সঙ্গে সরকার ও জনসাধারণের শিক্ষকদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মানসিক শান্তি ও উদ্যমের নিশ্চয়তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা সমীচীন নয়। শিক্ষক ও ছাত্র সমাজের যৌথ শক্তিই একমাত্র আগামী দিনের সার্থক জাতি গঠণ করতে পারে। সবচেয়ে বড়কথা সবাইকে মিলে দেশ ও জাতি গঠণের জন্য বন্ধুর পথে চলতে হবে—সেই চলা যেন হঠাৎ থেমে না যায়।

অধ্যাপক অজয় কুমার সেন
সভাপতি, ছাত্র সংসদ

ঝা দায়। কলেজে সাংস্কৃতিক চর্চা নেই বললেই চলে। পারলাম না নিজেদেরকে আটকাতে। পাড়ায় ত্রপরিষদের হয়ে কাজ করি কিন্তু কলেজে যে তার প্রধান ভূমিকা সেই দিনই প্রথম দারুণভাবে অনুধাবন করলাম। রও কয়েকজনকে সংগ্রহ করলাম। একদিন হাজরা পার্কের (যতীন দাস পার্ক) সবুজ ঘাসে, আমি, অমিতাভ চৌধুরী শমিৎ সেনগুপ্ত ও আরও কয়েকজন, তৎকালীন দক্ষিণ কলিকাতা জেলা ছাত্র পরিষদের আহ্বায়ক শ্রীঅনুপ চন্দ্রের নে শপথ নিলাম যে করেই হোক ছাত্র পরিষদের বিজয় পতাকা এই কলেজে তুলে এই কলেজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি তেই হবে। শুরু করলাম আন্দোলন। আমাদের আন্দোলনকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করলাম—

১) কলেজে শিক্ষার পরিবেশ ও শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা।
২) কলেজ সমস্যাকে জোরের সঙ্গে মোকাবিলা করা।
৩) কলেজ ছাত্রদের শিক্ষার প্রগতি, সংঘবদ্ধজীবন, দেশপ্রেম—এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা।

আমরা আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে প্রধানতঃ এই তিন রকম কর্মসূচীর উপর ভিত্তি করে জয় করে নিলাম এই কলেজের ছাত্রমনকে। নির্বাচনে প্রতিশ্রুত কর্মসূচীর বোধ করি ৯০% করতে পেরেছি। যেমন -

১) কলেজ চূণকাম করা।
২) General Breakage এর ৫০% আদায় করা।
৩) চীফষ্টোরের উন্নতি এবং নীচে নামিয়ে অনেক বেশী জনপ্রিয় করে তোলা।
৪) প্রচুর সংখ্যক ছাত্রের মাহিনা মকুব করা।
৫) Student's Aid Fund থেকে অধিকসংখ্যক ছাত্রকে সুবিধা দেওয়া।
৬) Chemistry 'A' Course চালু করা।
৭) Admission Test এর প্রবর্তন করা।
৯) সাংস্কৃতিক বৃত্তি চালু করা।
১০) সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য পরিষদ খোলা।
১১) কলেজে শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা।
১২) মণীষীদের আলোকচিত্র যথাযোগ্য সম্মানে অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক কক্ষে স্থাপন করা।
১৩) Union Room এর নতুন রূপ দেওয়া, প্রভৃতি।

ছাত্রসংসদে কাজ করতে এসে প্রায় প্রত্যেক বিভাগে সমানভাবে কাজ করতে পেরেছি। এখানে কোন ভাগের নিজস্ব কোন ভূমিকা নেই। তবুও বিভাগীয় উন্নতি, বিভাগ প্রধানরাই দেবেন। আমি শুধু বলতে পারি র প্রত্যেক বিভাগে কিছু উন্নতি এবং ছাত্রমনে কিছু আলোড়ন বোধহয় আনতে পেরেছি।

আমাদের যাত্রা সবে শুরু, এখনও অনেক কাজ বাকী, পারিনি এখনও Zoology এবং Botanyতে অনার্স ু করতে, প্রচণ্ড আক্ষেপ এই কারণে থেকে গেল। তবে আপ্রাণ চেষ্টা করবো এই অনার্সগুলো যাতে শীঘ্রই

আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ

১৯৭১-৭২

বাঁদিক থেকে বসে—সর্বশ্রী সোমনাথ বসু (সাংস্কৃতিক সম্পাদক), পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সাধারণ সম্পাদক), নীরোদ ভট্টাচার্য (অধ্যক্ষ), দুলাল কুমার মিত্র (উপাধ্যক্ষ, পত্রিকাধ্যক্ষ), অধ্যাপক অজয় কুমার সেন (সভাপতি), শমিং সেনগুপ্ত (সহঃ সভাপতি)।

বাঁদিক থেকে দাঁড়িয়ে—সর্বশ্রী তপন কুমার বর্দ্ধন (সহঃ সাঃ সম্পাদক), দিলীপ কুমার রায় চৌধুরী (সহঃ কমনরুম সম্পাদক), প্রেমনাথ সিং (কমনরুম সম্পাদক), রঘুনাথ সেন (ক্রীড়া সম্পাদক), দীপক দত্ত, ব্রজগোপাল দে (ক্যানটিন সম্পাদক), মানস ভুঁইয়া ও আর একজন ছাত্র।

স্বাধীনতার 'রজত জয়ন্তী সপ্তাহে' পুরস্কার বিতরণী সভায় দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করছেন শ্রীঅংশুমান রায়।

ছাত্র সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীশোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক, পঃ বঃ যুব কংগ্রেস।

আন্তঃ কলেজ পুরস্কার বিতরণী সভায় আমাদের কলেজ সম্বন্ধে আলোচনারত প্রাক্তন ছাত্র শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীসুনীল সিদ্ধান্ত।

ছাত্র সভায় বক্তব্য রাখছেন ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়।

সাধারণ সম্পাদকের দু-চার কথা—

"যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুম :
নতুন বিশ্বের দ্বারে ব্যক্ত করে অধিকার
জন্মমাত্র সুতীব্র চীৎকারে।"

হ্যাঁ, আমাদের সংগঠন জন্মমাত্র সুতীব্র আন্দোলনের মাধ্যমে এই কলেজের প্রতিটি ছাত্রবন্ধু'র মন কেড়ে নিয়েছে। যখন প্রথম এই কলেজে আমরা ছাত্রপরিষদের সংগঠন খুলেছিলাম, তখন কিন্তু মনে মনে ভয় হয়েছিলো, এই কলেজে আমাদের মতো জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠনের ভবিষ্যৎ কি হবে? যদিও উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে চলার পথের পাথেয় এবং আদর্শকে আগামী দিনের হাতিয়ার করে নিয়ে এই কলেজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির কাজে আত্মসমর্পণ করেছিলাম। পশ্চিম-বঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিশেষভাবে জাতীয়তাবাদী ছাত্রমনের প্রভাব যে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র সমাজে বৃদ্ধি পাচ্ছিল তা আমাদের সংগঠনকে দিয়েই বুঝতে পারছিলাম। মনে তাই দারুন উত্তেজনা আর উৎসাহ বোধ করেছিলাম।

আজ যখন সাধারন সম্পাদক হিসেবে কলম ধরতে বসেছি, তখন মনে দারুন উত্তেজনা বোধ করছি। তাহলে সত্যি সত্যিই আমাদের সংগঠনের আদর্শকে এই কলেজের ছাত্রগণ গ্রহণ করেছে। আর তারই ফল স্বরূপ বিপুল ভোটে জয়ী করে আমাদেরকে তাদের জন্য কথা বলবার সুযোগ করে দিয়েছে। ধন্যবাদ জানাই তাদেরকে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সহানুভূতি আর জোরালো সমর্থন আমাদেরকে ছাত্রসংসদ পাবার সুযোগ করে দিয়েছে। আমাদের গর্ব এইখানে যে আমাদের সংগঠনের জন্মবর্ষেই আমরা ছাত্রসংসদে বিপুল সমর্থন নিয়ে আসি। আমার ভাগ্য ও আনন্দ আরও বেশী কারণ আমি এই কলেজের আমাদের সংগঠনের ছাত্রসংসদলাভের প্রথম সাধারণ সম্পাদক, প্রথমে ভীষণ ভয় হয়েছিলো যে, এই বিরাট সমস্যাবহুল কলেজে আমি আমার দায়িত্ব ঠিক মত পালন করতে পারবো কিনা? পরে বিপুল ছাত্র সমর্থন ও সহকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম আমার সেই ভয়কে দূর করেছে।

আমরা প্রথমে যখন কলেজে ঢুকি তখন দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে কলেজে শিক্ষার পরিবেশ তো দূরের কথা, নেই কোন সুস্থ পরিবেশ যা দিয়ে নিজেদের আদর্শ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবো। চারিদিকে রাজনৈতিক প্রচারপত্রের ছড়াছড়ি। কলেজে ঢুকতে দেখি সিনেমার প্রচারপত্র এতই প্রবল যে কলেজে ঢুকছি না সিনেমাহলে ঢুকছি তা

ময়দান থেকে বলছি

আশুতোষ কলেজ ক্রীড়া জগতের এক স্মরণীয় নাম। সুতরাং এই কলেজের ক্রীড়া সম্পাদকের পদ লাভ করে আমি নিজেকে খুব গৌরবান্বিত মনে করেছি, কি করে এই মহান দায়িত্ব পালন করবো এ নিয়ে খুবই চিন্তান্বিত ছিলাম। কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকবৃন্দ ও আমার ছাত্রবন্ধুদের সহায়তায় আমি আমার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে চেষ্টা করেছি। কতটুকু সফল হয়েছি তা বিচার করবেন আপনারাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালিত বিভিন্ন বিষয়ক খেলাধুলায় আমাদের কলেজ প্রতি বিভাগেই অংশ গ্রহণ করে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে আসছে। এবার আমাদের কলেজ, আন্তঃকলেজ ফুটবল লীগ আশানুরূপ সাফল্য লাভ না করলেও আই, এফ, এ, পরিচালিত ইলিয়াট শীল্ডে রানার্স আপ হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। দীর্ঘ দশ বছর বাদে আমরা আমাদের হারান সম্মান কিছুটা পুনরুদ্ধারের সুযোগ পেয়েছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত আন্তঃকলেজ নক-আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়, কলেজ কোয়ার্টারি ফাইন্যাল পর্যন্ত উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ খেলা বন্ধ করে দেওয়ায় আমাদের পক্ষে আর এগোন সম্ভব হয়নি।

অনিবার্য্য কারণ বশতঃ কলেজের বার্ষিক স্পোর্টস এবারে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। আমরা আশা করছি আগামী বছর বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে আমরা এই অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তুলতে চেষ্টা করব।

এবার আন্তঃ কলেজ হকি লীগ ও নক আউট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত না হলেও কলেজের বাইরে কয়েকটি প্রতিযোগিতামূলক খেলায় অংশ গ্রহণ করে কলেজের সুনাম বৃদ্ধি করেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত সাঁতার, বাসকেটবল, নৌকাবাইচ প্রভৃতি বিষয়েও আশুতোষ কলেজের ছেলেরা প্রতিনিধিত্ব করে কলেজের সুনাম বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে। কলেজের ক্রীড়া বিভাগের উন্নতিকল্পে যে সব অধ্যাপকবৃন্দ অকুণ্ঠ ভাবে সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন সর্বশ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, প্রবীর রায় চৌধুরী, বিমলেন্দু ভট্টাচার্য্য, প্রভাত রায়, রাধাশ্যাম ঘোষ ও সহঃ অধ্যক্ষ দুলাল কুমার মিত্র এবং কলেজের অধ্যক্ষ স্বয়ং নীরদ কুমার ভট্টাচার্য্য। কলেজের সাধারণ সম্পাদক পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও সহঃ ক্রীড়া সম্পাদক বিজেষ দত্ত কলেজের ক্রীড়া বিভাগের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট সাহার্য্য করেছেন।

কলেজের ক্রীড়া সম্পাদক হিসাবে আমি আশাকরি আগামী বছরেও কলেজের ছাত্রবন্ধুরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করে কলেজকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলেজ রূপে পরিণত করবে। সবশেষে সকল ছাত্রবন্ধুকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার কলমে ইতি টানছি।

ময়ূখাভ সেন
ক্রীড়া সম্পাদক

চালু হয়। আমি ভাবতে চেয়েছিলাম আমাদের কলেজ 'সবার সেরা" হয়ে উঠুক, সেই কারণে চেষ্টাও চালিয়েছি। ভবিষ্যৎ বলে দেবে কতটা করতে পেরেছি, শুধু আমার অনুরোধ আমাদের আগামী নেতৃত্ব যেন আমার এই ভাবনাকে সুদৃঢ় করে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে যে পথের সূচনা, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী ও শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সৌহৃদ্য নেতৃত্বে যেন সে পথের বিজয় স্তম্ভে আমরা সবাই পৌঁছাতে পারি। সমগ্র ছাত্র সমাজকে সেই আহ্বানই জানাই।

পরিশেষে বলতে চাই, এই পত্রিকাকে সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চেয়েছি, জানিনা কতটুকু সফল হয়েছি। শুধু পাঠকরাই তার বিচার করবেন। ধন্যবাদ জানাই অধ্যক্ষ ও সহ অধ্যক্ষ শ্রীনীরোদ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীদুলাল কুমার মিত্র এবং অধ্যাপক শ্রীঅজয় সেনকে ও শ্রীসুনীল সিদ্ধান্তকে, যাদের আশীর্বাদ ও সহানুভূতি পেয়ে সব কাজ করতে পারছি। অভিনন্দন জানাই আমাদের প্রিয় সহকর্মী শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী, শ্রীস্বপন কর, শ্রীঅমিত মিত্র এবং শ্রীনির্বেদ রায়কে যাদের পরিশ্রমে আজ আমরা ছাত্রসংসদে কাজ করার সুযোগ পেলাম। সবশেষে ধন্যবাদ জানাই আমার সহযোগী শ্রীতপন কুমার বর্দ্ধনকে যে সব সময় আমার পাশে থেকে আমার কাজ করেছে। আর কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের কলেজের সান্ধ্যবিভাগের শ্রীঅরবিন্দ ঘোষকে যার বুদ্ধি ও উপদেশ আমার চলার পথে সাহায্য করেছে।

জয় হিন্দ

দেশপ্রেমিক অভিনন্দন সহ

শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক

আশুতোষ কলেজ ছাত্রসংসদ

ামাদের Unionএর চাপে পড়েই কলেজ কর্তৃপক্ষ কিনতে বাধ্য হয়েছেন। আমি জানি আমাদের কলেজে প্রচুর ন্ধু আছেন যাঁদের ভিতরে প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে। অনুশীলনের অভাবে তাঁরা সেটা সকলের সামনে তুলে ধরতে ন না। এই সকল প্রতিভাময় ছাত্র বন্ধুদের কথা বিবেচনা করেই নতুন বোর্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ প্রত্যেকটি ছাত্র বন্ধুদের আহ্বান জানাচ্ছি, তাঁরা যেন তাঁদের অবসর সময় Commonroomএ এসে খেলাধূলার রেন এবং আমাদের কলেজের তথা দেশের নাম উজ্জ্বল করেন।

নিম্নে গত বছরের Champion এবং Runnerএর নাম দেওয়া হইল।

	Champion	Runners
ল টেনিস :—	দ্বিজেষ দত্ত (প্রথম বর্ষ কলা)।	দীপেন দত্ত (তৃতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান)।
াম :—	সৌমিত্র মুখার্জী।	বাপ্পু মল্লিক
:—	তরুন মুখার্জী।	স্বপন ব্যানার্জী।

Commonroom এর উন্নতির কাজ এখনো শেষ হয়নি, এই তো সবে শুরু, তাই Commonroomএর উন্নতির আমি আমার প্রত্যেকটি ছাত্র বন্ধুর সহযোগিতা কামনা করি। আমার কাজের সহযোগি শ্রীদিলীপ রায় চৌধুরীকে াদ জানাই।

নমস্কার—

প্রেমনাথ সিং

কমনরুম সম্পাদক

নৃপেন চক্রবর্ত্তী
অধিনায়ক, আশুতোষ
কলেজ (ফুটবল)

দ্বীজেন দত্ত
কলেজ টেবিল টেনিস
চ্যাম্পিয়ন

এ. কে. ভাদুড়ী
স্কাউট বিভাগে, আমাদের
কলেজের সুনাম রক্ষা
করেছেন।

ঘটনা প্রবাহ

- প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় কলা বিভাগে আমাদের কলেজের ছাত্র শ্রীপ্রসেনজিৎ সরকারের প্রথম স্থান লাভ।
- প্রথম রাষ্ট্র হিসাবে ভারতবর্ষের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি।
- জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজবাদের আদর্শ নিয়ে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা।
- পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সন্ত্রাসের অবসান।
- পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেসের এককভাবে ২১৮টি আসনলাভ ও বামপন্থী মোর্চা ভূপতিত।
- কলেজ নির্বাচনে ছাত্রপরিষদের শতকরা ৯৫ ভাগ কলেজে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ছাত্রসংসদ লাভ।
- পশ্চিমবঙ্গে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসা ও খুন জখমের অবসান।
- বিভিন্ন কলকারখানা থেকে ক্লোজার-লকআউট প্রত্যাহৃত।
- খরায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ক্ষতিগ্রস্থ।
- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এবার শতকরা পাশের হার খুব কম।
- যামিণী রায়, প্রশান্ত মহলানবীশ ও নির্মল বসুর মৃত্যু।
- হীক্স এবং এ্যারো'র নোবেল পুরস্কার লাভ।
- বিশ্বসংবাদ—চীনের রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রবেশ। বিশ্ব অলিম্পিকে ৯ জন ইজরায়েলী খেলয়াড় নিহত।

আমার কথা

নমস্কার,

আমি Commonroom Union পাবারপর ছাত্রদের সুখ আমরা কতটুকু উন্নতি সাধন করতে আসি।

দিকে বিরাট ঘরখানা দেখছেন, ঐটাই দেওয়ালে টাঙানো মণীষীদের নতুন আকর্ষণ করছি। 'নতুন' কথাটি এই Union পাবার পুর্বে এগুলো সব ভাঙ্গা গ্রহন করার পর প্রথমেই আমরা ছবি- হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন সবকটা করে? বাংলা দেশে যারা আছেন থেকে কয়েক মাস পুর্বে আমাদের দেশে একটি 'মুর্তি ভাঙ্গা'র রাজনীতির দল ছিল। তাঁদের হাতে আমাদের বহু মণীষীর মুর্তিই মাটির সাথে মিলিয়ে গিয়েছিল। এদের হাত থেকে আমাদের Commonreom এর ছবিগুলিও বাদ পড়েনি। জানিনা তারা এই সকল মণীষীদের এইভাবে মাটির সাথে মিলিয়ে দিয়ে আমাদের দেশে কোন বিপ্লব আনতে চেয়েছিল? মণীষীদের মুর্তি ভেঙ্গে দেশে বিপ্লব আনা যায় না। আমি অন্ততঃ এই কথাই বিশ্বাস করি। তাই 'মুর্তি ভাঙ্গা' রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাস করি না। বরং ঠিক তার বিপরীত নীতিতেই বিশ্বাস রাখি। মানে আমরা মুর্তি গড়তে চাই। কারণ মণীষীদের ছবি দেখে তাঁদের বাণীর কথা মনে পড়ে যায়, তাঁদের আদর্শের কথা মনে পড়ে যায়, যেটা আমাদের জীবনে উন্নতি করার জন্য মনে প্রেরণা জাগায়। এবার দেখুন ঐ বইয়ের আলমারির দিকে, কিছু নতুন বই দেখতে পাবেন। Students' Union আমাদের হাতে আসার পরই কিন্তু এই নতুন বইগুলি আলমারির শোভা বৃদ্ধি করেছে। আমার মনে হয় ছাত্রবন্ধুগণ বইগুলি পড়ে উপকৃত হবেন।

Secretary কথা বলছি Students' সুবিধার জন্য Commonroom এর পেরেছি চলুন সেটা দেখিয়ে নিয়ে

সিঁড়ি থেকে উঠেই ঐ যে ডান আমাদের Commonroom. প্রথমেই ছবিগুলির দিকে আপনাদের দৃষ্টি জন্য প্রয়োগ করলাম যে আমাদের অবস্থায় ছিল। Union এর কার্যভার গুলি নতুন করে লাগিয়েছি। আপনারা মণীষীর ছবি একসঙ্গে ভাঙল কি তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন যে আজ

এবার আসুন আমাদের Commonroom এর Indoor game দেখবেন। খেলাধুলা বলতে বড় বড় খেলাকেই আমরা সাধারণতঃ বুঝে থাকি (যেমন ফুটবল, ক্রিকেট, হকি)। কিন্তু টেবিল টেনিস, ক্যারাম, দাবা এগুলো যে খেলাধুলার অংশ এটা কিন্তু অনেকেই স্বীকার করতে চান না।যার ফল স্বরূপ আজ আমাদের দেশ Indoor gamesএ প্রাচ্যের দেশের তুলনায় এতটা পিছিয়ে পড়েছে। Indoor games এর মান উন্নত করার দায়ীত্বটাও কিন্তু আমাদের ছাত্র সমাজের হাতে। ঐ যে নতুন দুখানা টেবিল টেনিস এবং দুখানা ক্যারাম বোর্ড দেখতে পাচ্ছেন ওগুলো

Statement about ownership and other particulars of the Asutosh College Magazine—

1.	Place of publication	Calcutta
2.	Periodicity of publication	Yearly
3.	Printer's Name	Prncipal, Asutosh College
	Nationality	Indian
	Address	92, Shyamaprasad Mookherjee Road, Calcutta-26.
4.	Publisher's Name	Principal, Asutosh College
	Nationality	Indian
	Address	92, Shyamaprasad Mukherjee Road, Calcutta-26.
5.	Editor's Name	Mukundalal Bhattacharya
	Nationality	Indian
	Address	Asutosh College, Calcutta-26.
6.	Names and Address of the individuals who own the newspaper or publication	Asutosh College

I, Nirod Kumar Bhattacherjee hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/- N. K. Bhattacharjee
Publishers
ASUTOSH COLLEGE MAGAZINE

The magazine is printed and publisned in the official capacity of the Principal. The name of the Principal is Nirod Kumar Bhattacharjee

আমার বক্তব্য

ছাত্র পরিষদের ছাত্র সংসদ লাভের পর এই কলেজের সবচেয়ে অবহেলিত সাংস্কৃতিক বিভাগের দায়িত্ব আমার উপর দেওয়া হয়। এই বিরাট দায়িত্ব আমাকে সব সময় সচেতন করে রেখেছে। আমিও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি কি করে ছাত্রদের সাংস্কৃতিক মান উন্নত করা যায়। যদিও বিশ্বাস রাখি দু'একটা বইএর দোকান পুড়িয়ে লাভ হবে না। কারণ আমাদের ঘরেই রয়েছে অপসংস্কৃতি, বিরাট ব্যাভিচার। তাই আমার প্রথম ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করেছিলাম সমস্ত দেওয়াল রং করে অশ্লীল বাক্যকে নির্মুল করতে।

ছাত্রদের কাছে বিরাট প্রশ্ন Social কেন হয় না? তাদের জ্ঞাতার্থে বলছি আমরা যখন Union পাই তখন Already Social এর নামে ১৫০০ টাকা গ্রহণ করা হয়, যে টাকা অনেক দাবী করার পর দু'এক দিন আগে পেয়েছি। ইচ্ছা আছে কয়েক দিনের মধ্যেই করবো।

এবার রবীন্দ্র জয়ন্তী বিরাট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়। আবৃত্তি, প্রতিযোগিতার ও আয়োজন করা হয়েছিল। আমরা কলেজে এবছর প্রথম 'রাখিবন্ধন' উৎসব পালন করি। উদ্যোক্তা আমাদের বন্ধু পার্থকেও এজন্য ধন্যবাদ যার চেষ্টায় উৎসবের সূচনা।

এবছর স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বর্ষ। আমার মনে হয় আমরাই একমাত্র কলেজ, যারা এক সপ্তাহ ব্যাপী এই অনুষ্ঠান করেছে। সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান আন্তঃ কলেজ বির্তক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শুরু হয়। উদ্বোধন দিনে উদ্বোধক শ্রীসৌগত রায়কে (সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি) আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম। বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা, আবৃত্তি ও সিনেমা শো '৭২' অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রদের বিপুল আনন্দ ও উত্তেজনা আমাদের কাজের সফলতাই প্রমাণ করে।

পরিশেষে আমাদের কথা মতো আমরা 'সাংস্কৃতিক পরিষদ' ও 'সাহিত্য পরিষদ' খুলে দিয়াছি। এজন্য আমাদের দাবী 'সাংস্কৃতিক বৃত্তি' ব্যবস্থাও চালু হয়েছে। আমার আশা, আমার চেষ্টা আগামী দিনে আমাদের কলেজকে সাংস্কৃতিক দিক থেকে সবার উপরে রাখবে। ধন্যবাদ জানাই উপাধ্যক্ষ শ্রীদুলাল কুমার মিত্র ও অধ্যাপক শ্রীসুনীল সিদ্ধান্ত কে যাদের উপদেশ আমাদের কলেজের উন্নতি-কল্পে সাহার্য করেছে।

বিনীত—

সোমনাথ বসু

(সাংস্কৃতিক সম্পাদক)

LIST OF EDITORS
1946–1972

Editor-in-chief : Pijuskanti Chatterjee, Arun Kumar Dasgupta, Naresh Chandra Ghosh, Suhas Kumar Roy, Ramprasad Chakravarty, Amal Kumar Chakravarty, Miss Samjukta Kar, and Miss Srimati Chakravarty (1946).

Editor-in-chief ; Sobhanlal Mukherjee, Arun Mukherjee, Asoke Sengupta, Asoke Chatterjee, Ranjit Ganguly, Sukumar Banerjee and Miss Puspanjali Sen (1947).

Editor-in-chief ; Tejen Guha Roy, Miss Nilima Bose, Miss Bithi Sen, Sunil Dasgupta, Pratul Bardhan Roy, Prithiwis Roy Choudhury, Prankrishna Bhattacharya and Bireswar Banerjee (1948).

Satyen Mukherjee and Miss Jayasree Choudhury (1949)
Madhusudan Ghosh (1950)
Arun Kumar Roy (1951), Smritibikash Ghosh (1952)
Dulal Das (1953)
Gopal Chandra Banerjee (1954)
Samarendra Sengupta (1955)
Ashim Sengupta (1956)
Malayasankar Dasgupta (1957)
Ajay Gupta (1958)
Tripti Kumar Chatterjee (1959)
Gopal Bandyopadhyay (1960)
Sukanta Kumar Roy (1961)
Barun Kumar Banerjee (1962)
Jayanta Kumar Roy, Amit Kumar Ganguly (1963)
Ashim Thakur, Suprakash Saha (1964)
Satyabrata Sanyal, Bhabesh Ch. Basu (1965)
Bhagirath Misra, Hiraksubhra Pandey (1966)
Ajit Kumar Mukhopadhyaya, Ranadev Sarkar (1967)
Biswarup Roy Choudhury, Bhabani Prasad De (1968)
Jiten Bhowmik, Chandra Sekhar Chokraborty (1969–70)

ঠিক বেঠিক

পৃষ্ঠা	ভুল	ঠিক
১৮	বাণীতে 'প্রাচীণ'	প্রাচীন।
২৮	শেষ লাইনে—'জলস্থ'	জলন্ত।
৩৩	বাণীতে—'পুণরাবৃত্তি'	পুনরাবৃত্তি।
১৯	টাইটেলে—'Houn'	Hons.
৩৯	দ্বিতীয় লাইনে—'নাট্যকাররূপে'	নাট্যকাররূপে।
৪৫	বাণীতে—'মানবজাতী'	মানবজাতি।
৫৬	নবম লাইনে—'Wlhile'	While,
৫৭	টাইটেলে – 'সাম্মানিক'	সাম্মানিক।
৬০	প্রথম লাইনে – 'থাকিব'	থাকবি।
৭১	ত্রয়োদশ লাইনে—'শেষ করলাম'	শেষ প্রশ্ন করলাম।
৭৩	অষ্টম লাইনে—'তরুনের'	তরুণের।